আরও কথা বলো

আরও কথা বলো

[illegible]

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই জ্যৈষ্ঠ,
১৮৮২ শকাব্দ

২'৭৫
নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

দূর থেকে
যাঁরা আমার লেখা ভালবাসেন, সেই
অপরিচিত ও. অজ্ঞাত পাঠকদের উদ্দেশে

এই উপন্যাসখানির আদিরূপ 'হে অতীত, কথা কও' নামে শারদীয়া যুগান্তরে (১৩৫৮) প্রকাশিত হয়। তখনও বঙ্গসাহিত্যে অতীতের বান ডাকে নি। তারপর 'গল্প-ভারতী' পত্রিকায় আষাঢ় (১৩৬৩) থেকে শ্রাবণ (১৩৬৪) পর্যন্ত বইখানি উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'হে অতীত, কথা কও' নামটি গ্রহণ করে একাধিক ব্যক্তি পুস্তক প্রণেতা হয়েছেন। অতএব আমিই আমার প্রিয় নাম পরিবর্তন করলাম।

আমার পরাজয়ের পলাশী-প্রাঙ্গণ সেই বাড়ীখানা। আজ মেঘ-মলিন আষাঢ়ের আকাশ মনে পড়াইয়া দেয় অনেক দূরে কিন্তু এই নগরের একপ্রান্তে বাড়ীটি জানালা-দরজার চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। তাহার রহস্যময় সত্তা একমুহূর্তের জন্য দুই হাতের মুঠির মধ্যে ধরিতে পারিয়াছিলাম প্রথম দিন। আমি ১৩৫৮ সালে প্রথম আষাঢ় মাসে বাড়ীর কক্ষতলে পদার্পণ করি। ১৩৫৮ সালের আশ্বিন মাসে বাড়ীখানির কাহিনী কোন সাময়িকী পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম। তারপর সেই বাড়ীর কাহিনী আরও কেউ বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, সে গল্প কেউ বলিতে পারে নাই। আমিও সে গল্প সম্পূর্ণ ধরিতে পারি নাই।

আমার দৃষ্টি জন্মান্তরের তমোজালে আবৃত। যে দিব্যসত্তা প্রতিটি প্রাণীর মর্মকোষে চির-জাগরূক, বর্তমানের বস্তুকুয়াশায় সেই তৃতীয় নয়ন রুদ্ধ। অস্পষ্ট, ঈষৎ ম্লান স্মৃতিকণায় আলো নাই। কখনও সে ধরা পড়ে, কখনও ধরা পড়ে না। অতীত কথা বলে, কিন্তু সর্বদা নয়।

অতীতের একখানা পাতা মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খল বাতাসে চোখের কাছে আসে। সময় স্থির হইয়া দাঁড়ায়, অতীতে বর্তমান গ্রথিত হইয়া যায় এক নিমেষে। যায় না ? আচ্ছা, শোন একটা গল্প বলি।

প্রকাণ্ড বাড়ীর সাদা কালো চেকবোনা পাথরে ভেলভেটের চটী টানিয়া লম্বা পাকদণ্ডির মত সোপান বাহিয়া একজন তরুণী উঠিতেছে চারতলায়।

কলিকাতার হৃৎপিণ্ডের নীচে অসংখ্য ধমনী, স্নায়ুজাল। গুপ্ত শ্রোণিতধারার বাহক তাহারা। সরু-সর্পিল গতিতে সারা শহরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে কলিকাতার গলি-পথ। তবু, নিজের

রহস্য তাহারা কাহাকেও বিলাইয়া দেয় না। এক-একটি গলি এক-একটি দেশের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাহার নিজস্ব চরিত্র আছে। আবছা অন্ধকার রাজত্বে পা দেওয়া মাত্র পথিকের নবজন্ম। বাইরের জগৎ হইতে সে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। গলির মুখ পার হইলে যে রাজপথ, ট্রাম-বাস, জনতা, গলির মধ্যে সে-সব স্মৃতিমাত্র। সামনের তিনতলা বাড়ী, এঁদো একতলাখানা, খাবারের দোকান, মুদিখানা, কোন বাড়ীর রেলিংএর পাশে আধমরা পামগাছ, কোন কাঁচের শার্সির আড়ালে নীল পরদা—এইসব একমাত্র সত্য। এই গলির বাইরে জীবন নাই।

এই গলি হইতে অন্য গলি বাহির হইয়াছে দক্ষিণে, বামে সেই গলি হইতে অন্য গলি গিয়াছে। সে গলিও বিস্তারলাভ করিয়াছে। অতএব কলিকাতার মধ্যমণি চৌরঙ্গী হইতে কেবল গলির পর গলির সুড়ঙ্গ বাহিয়া গঙ্গার অন্তকেন্দ্র শহরের শেষে উপস্থিত হওয়া কঠিন নয়। তারপর সেই গঙ্গায় বজরা, ছিপ, ডিঙি, ষ্টিমার, জাহাজ, গাধাবোট আশ্রয় করা চলে। কতদূরে যাওয়া যায়—চীন, জাপান, পারস্য, ইংলণ্ড। তোমরা কোথায় যাইতে চাও, বল?

সেই বাড়ীখানা মধ্য-কলিকাতার গলির বুকে—এমনি এক গলির বাসিন্দা। বাইরে সে মৌন-মূক, কিন্তু বহুদিনের বহু কথা তার সিঁড়ির পাকে, আলিসার বাঁকে, ছাদের চত্বরে জমানো আছে। প্রাচীন যুগের অন্তে নূতন যুগে নূতন মানুষ পুরাতন অঙ্গনে বিজাতীয় পাদুকাশব্দ বর্ষণ করিয়া চলে। বাড়ীখানা নিঃশব্দে চাহিয়া থাকে। কাহাকেও রসাশ্রিত ব্যক্তি বলিয়া সে মনে করিতে পারে না। যদি কোন মুহূর্তে দুর্লভ আগন্তুক দেহলী অতিক্রম করে, সে তবে কয়েকটি কথা বলে। সে আর বোবা থাকে না।

মধ্যযুগীয় বাড়ীখানার বিরাট পরিধি একজন ভোগ করিতে পারে নাই। অনেক ভাড়াটের মধ্যে সতীর অঙ্গের মত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তীর্থ-

ক্ষেত্র—চায়ের, আমদানী-রপ্তানীর, পত্রিকার, প্রেসের, সর্ববিধ ব্যবহার্য দ্রব্যের ছোট-বড় অফিস, বরণের ডালার নানাবিধ দ্রব্যজাতের মত বাড়ীটি ধরিয়াছে। সম্প্রতি সেখানে একটি নূতন সিনেমা-কম্পানির ভিত্তি স্থাপনা হইয়াছে। অসংখ্য কর্মকেন্দ্র বাড়ীটির মধুচক্রে আর একটি খোপ নবীন চিত্র-নির্মাতারা সাজাইয়া বসিয়াছেন। নূতনত্ব আরও যে ইঁহারা কেহই পেশাদার নয়। অধিকাংশ ব্যক্তিই সাহিত্যের ধারে-কাছের ব্যক্তি।

তেতলার সিঁড়ির চাতালের বিভিন্ন দিকে গতি। একদিক ছাদে চলিয়াছে। খোলা ছাদের শেষপ্রান্তে দুইখানা ঘর কাঠের বেড়া-ঘেরা, অ্যাসবেস্টসের ছাউনী। কিন্তু, তবু সুন্দর। কর্মকর্তারা খাঁটি-সিমেণ্টের পরিবর্তে খোলা ছাদ পছন্দ করিয়াছেন, কাঠ ও অ্যাসবেস্টস্ [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা শিল্পী।

আরও একটু দূরে চায়ের ক্যাণ্টিন। গোটা বাড়ীর চা যোগাইবার অঙ্গীকার ওখানে। উঁচু নিরন্ধ্র প্রাচীরের নীচে চারতলার ছায়ার অন্ধকার সরু গলি। বঙ্কিম গতি তার।

যে তরুণীর পদপল্লবের চটী শতাব্দীর প্রাচীন মার্বেলে সঞ্চিত নীরবতা ব্যাহত করিতেছে, সে তরুণী গ্রামোফোন কম্পানিতে গান লিখিয়া থাকে। সিঁড়ির মুখে প্রকাণ্ড কাঠের থাবা লোহার রেলিংএ। তরুণী সিঁড়ির ধাপে ঊর্ধ্বগামিনী। পাশের চত্বরে সাদা-বেগুনী ছিট-বোনা টাইল—গরাদঘেরা জানালায় সরু গলির উঁকি দেখা যায়।

এই গলিটির রূপ একটু বিচিত্র। শহরের গৃহস্থ গলি নয়, যেখানে একগোছা সোনার চুড়ি-পরা হাতে, কিম্বা দুই গাছি ব্রঞ্জের চুড়ি-পরা হাতে সন্ধ্যায় শঙ্খ বাজে, রকে মোহনবাগানের সমালোচনা, বৈঠকখানায় দাবার পাট। এই গলি বিদেশী, বাংলা দেশের বাইরের রূপ তার অঙ্গে।

বেলা-শেষের ম্লান অন্ধকার গলিটির মধ্যে ঘনীভূত। আশে-পাশে,

কাছাকাছি চীনা পাড়া। সাদা মোমের মত মুখ বাতির আলোকে নীচু হইয়া জুতার চামড়া কাটিতেছে। হলুদ চামড়ার উপর স্বেদকণা নিবিড় হইয়া জমিয়া উঠিতেছে চীনা-দর্জির অবিরত কলের পেষণ-শ্রমে। ঢিলে-পোশাক চীনে মা থ্যাবড়া ধাঁচের বাচ্চাকে কোলে লইয়া নোংরা পরদা তুলিয়া গৃহের অভ্যন্তরে ঝোলানো দোলনার দিকে চলিতেছে।

সেই পাশে এক প্রেসের ব্লাইণ্ড লেনে রাস্তার উপর চীনে ঘরকন্না। চৌকাঠবিহীন দরজা পার হইলে রান্নাঘর। ধূসর চীনা সিল্কের হাতকাটা জামা পরিয়া চৈনিক সুন্দরী অতি প্রকাশ্যভাবে হাঁসের রোস্টের আয়োজন করিতেছে, আজ হয়তো তাহাদের উৎসব। জুতার দোকানের দোকানদার টুল টানিয়া বাহিরে বসিল। রুক্ষচুলো চীনে খুকীর ছুটাছুটিতে নিথর নৈঃশব্দ একটু ত্নলিয়া উঠিল। হঠাৎ আগত জন মনে করিতে পারে দেশটি ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে। কি সূত্র বাংলার শ্যামল-শোভন ভূমিশ্রীতে ইহাদের আনিয়া ফেলিয়াছে?

কেয়া সোমের মুখ ফিরিল। জানালায় নয়। পীত জাতির দর্শন তাহার মনে অশান্তি মাত্র বহন করিল; অস্বস্তি, সমগ্র সত্তার উপলব্ধিতে অশুভ কোন আবির্ভাব। নূতন যুগের নূতন মানুষ অতীন্দ্রিয়ের নির্দেশ তো গ্রাহ্য করে না।

যে শতাব্দী আজ বিগত, এই ইঁট পাথরের আড়ালে তাহার ব্যঞ্জনা আবৃত। সে শতাব্দী ঘুমন্ত কিন্তু বিলুপ্ত নয়। কাল প্রতিটি যুগের উপাদান লইয়া করে কি? জাগতিক উপকরণ যায় কোথায়? কাল উন্মুক্ত গহ্বর নয়, কালের সুড়ঙ্গপথে এক মুখে যাহা প্রবিষ্ট হয়, অন্যমুখে তাহা অদৃশ্য হয় না নিঃসীম শূন্যে। কোথাও থাকে যুগের সঞ্চয়, যুগান্তে যাহা বাসিফুলের মত পরিত্যক্ত। কোথাও বালিকার খেলাঘরের মত সাজানো থাকে—সবকিছু। আমার কাহিনীর জীবন-দর্শন তাই।

কেয়া সোম সিঁড়ির ঠিক নীচে এতক্ষণে চলিয়া আসিয়াছে বাঁ-পাশে সারিবদ্ধ চায়ের কাঠের বাক্স। দক্ষিণদিকে জানালা। সন্ধ্যার মুখেও বৃহৎ বাড়ী নির্জন নয়। তবু হঠাৎ সিঁড়ির কাছে সর্বশরীর তাহার শিহরিয়া উঠিল বিনা কারণে।

রক্ত? পায়ের নীচে কাল পদ্মের বুকে একবিন্দু চুণীর মত ও কি? বেগুনি-সাদা টাইলের গাঁথুনীতে কাল পদ্ম। পদ্ম কি শোণিতক্ষরণের শুষ্ক বর্ণে কাল, না শতাব্দী-পূর্বের কারিগর রক্তাভ পদ্ম গাঁথে নাই?—অর্ধ-বর্বর, ক্ষমতালোভী দেশে রক্তপাতের বন্যা রক্তবর্ণে অভিরুচি নষ্ট করিয়াছিল।

কেয়া সোমের ত্রস্ত চরণ প্রস্তরীভূত হইয়া গেল। ভেলভেটী পাদুকার মৃদুশব্দ আবৃত করিয়া ক্ষীণ বহুদূরের একটি কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল, 'না, না'।

না, না? কেন, কেন? কিসের জন্য তুমি নিষেধ করিতেছ? তুমি কি বলিতে চাও: কেয়া সোম, যেও না। এ বাড়ীর রহস্য গোপন, অতলান্ত। শতাব্দী ধরিয়া এই গৃহ যে রহস্য বুকে ধরিয়া আছে, তাহা যে চোরাবালি। কেয়া সোম, একবার পদস্খলন হইলে তুমি যে ডুবিয়া যাইবে, তুমি অদৃশ্য হইবে।

কেয়া সোম, তোমার মত অনেক সত্তা এই বাড়ীর অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। মনে তোমার বড় অহঙ্কার, তুমি গান লিখিতে পার। রবীন্দ্রনাথের পরে প্রেমসঙ্গীত কোন পুরুষ শিল্পীর লেখনীতে ধরা দেয় নাই। ধরা দিয়াছে ঐ তোমার মণিপ্রভ, সূক্ষ্মাগ্র অঙ্গুলীতে। কিন্তু, কেয়া সোম, মরণের অন্ধকারে যে সহস্র প্রতিভার সমাপ্তি ঘটে। যে বিদায়-সঙ্গীত কিংশুক-চম্পকের ফুল্ল পরাগে লেখা আছে, বসন্ত-বিদায়ের সেই সকরুণ ইঙ্গিত পাই প্রতিভার মুমূর্ষু পদক্ষেপে। সামান্য কেয়া সোম, জান না জীবনমৃত্যুর রহস্য কি।

ছাদে বেতের টেবল-চেয়ার সাজাইয়া কম্পানির কর্মকর্তা ও অংশীদারবৃন্দ বসিয়া আছেন। বেয়ারা সনাতন চা যোগাইতেছে। চুরোটীকা-ধূমে বায়ুস্তর সুনীল। কেয়া সোম চারতলায় উঠিয়া বসিল। যথারীতি সম্মুখে চায়ের পাত্র আসিল।

ভাবী চিত্রের ভাবী পরিচালক সৌম্যেন সেন কড়া চুরুট পাকাইতে পাকাইতে বলিলেন, "মিস সোম, তাহলে গানগুলো লিখতে শুরু করুন। তাড়াতাড়ি ধরে বইখানা শেষ করেই আর একটায় হাত দেব।"

কেয়া সোম কিছু বলিবার পূর্বেই ভাবী চিত্রের ভাবী সঙ্গীত পরিচালক বলিয়া উঠিলেন, "গল্প ঠিক না হলে উনি গান কি করে লিখবেন?"

ভাবী ক্যামেরাম্যান বলিলেন, "তাহ'লে শান্তি সেনের আর অমল রায়ের গল্প দু'টোর মধ্যে কোন্‌টা স্থির হ'ল?"

ভাবী চিত্রনাট্য-রচয়িতা বলিয়া দিলেন, "আমার তো কোনটাই বিশেষ পছন্দ হচ্ছে না।"

একজন রেস্তদার ডিরেক্টর বলিলেন, "আরও কয়খানা গল্প আমি পেয়েছি। তার মধ্যে থেকে বেছে নিলেও হবে।"

ভাবী আর্ট ডিরেক্টর বলিলেন, "কি বিষয়ে ছবি তোলা আপনারা স্থির করেছেন, বলুন না? পৌরাণিক, না সামাজিক? ঐতিহাসিক, অথবা রোমান্টিক?"

সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। আর একজন ডিরেক্টর মন্তব্য করিলেন, "গল্পগুলো সব পড়া হোক। তার পরে বাছা হবে।"

অন্য একজন বলিলেন, "এতদিন ধরে বাড়ী ভাড়া করে আমরা জমা হয়েছি, মনোমত গল্পই একটা পাওয়া যাচ্ছে না।"

আজ সিনেমা কম্পানির বিশেষ একটি জটলা আছে। কেয়া সোমকে কম্পানির কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে নানা আশায়। অতএব সৌম্যেন সেন কড়া চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিবার পূর্বে কেয়া

সোমকে সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, "মিস সোম, আপনার জানা ভাল গল্প আছে?"

গল্প? হ্যাঁ, গল্পই তো। চমৎকার গল্প একটি আকাশের উড়ন্ত সাদা মেঘের পাখায় লিখিয়াছে বিধাতার অদৃশ্য কলম। যার চোখ আছে সে পড়িয়া লও। অতীতের পুস্তক হইতে ছিন্নপত্র উড়িয়া আসিল।

"আমি রাত্রে ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি। একটা কালো প্রকাণ্ড বাঘ যেন আমার বুকের ওপর চেপে শুয়েছে জোয়ান মানুষের মত। ধারালো নখ তার আমার মুখ-হাত-পা আঁচড়ে যাচ্ছে দম দেওয়া ইস্পাতের কলের মত। ক্ষত-বিক্ষত মুখ থেকে ধারায় ধারায় রক্ত ঝরছে।" ১লা শ্রাবণ

"আমার এই বাড়ীতে বিয়ে হয়েছে। বৈশাখ মাসে বিয়ে হ'ল ষোল বছর বয়সে। আমার স্বামীর বয়স কুড়ি বছর। বি. এ. পরীক্ষার বছর এটা। বিয়ের পর মাত্র দু'চারবার দেখা হয়েছে স্বামীর সঙ্গে, তা-ও দূর থেকে। তারপরেই উনি হস্টেলে চলে গেলেন। বাড়ী থাকলে নাকি পড়া নষ্ট হ'বে।

ফুলশয্যার রাত্রে ঘরে অনেক লোক ছিল। সারা ঘর শ্বশুর-বাড়ীর লোকেরা ফুলের মালায় সাজিয়েছিলেন। বাবা-মা তত্ত্ব পাঠিয়েছিলেন যথেষ্ট। আমার শ্বশুরবাড়ী বনেদী বড় মানুষ। ইংরাজ আমল থেকে কলকাতায় বাস। তাঁদের উপযুক্ত তত্ত্বে বাড়ীর দরদালান ঢেকে গেল।

গোলাপী পার্শি শাড়ী পরাল আমাকে, ফুলের গয়নায় জড়োয়া গহনা মুছে দিল। সন্ধ্যা থেকে রসুনচৌকী বাজছে। মাটির সরায় ভাঁড়ারে খাস্তার কচুরী, বরফি, মনোহরা সাজানো। যাঁরা আসছেন, হাতে হাতে দেওয়া হচ্ছে। গোলাপী খিলি চিবিয়ে ছেলেবুড়ো মুখ রাঙা করে ফেলেছে।

আতরমাখানো লাল একখানা রুমাল কোমরে গোঁজা। হাতের তেলো আলতার হাল্কা রঙে রাঙিয়েছে। পায়ের পাতায় আলতার গোলায় লতাপদ্ম কেটে দিয়ে গেল শ্বাশুড়ীর পুরনো নাপতিনী। কি ঢং তার! চোখ মেলে দেখা যায় না।

পরণে একহাত চওড়া কালপেড়ে শাড়ী; হাতে বালা, উপর হাতে সাপতাগা, কানে ইহুদি মাকড়ি। নাপতিনীর এমন সাজ আমি দেখিনি। দাঁতে মিশি, মুখে পান। একটি ঘণ্টা ধরে ঝামা দিয়ে পা ঘষে, নখের ডগা নরুণ দিয়ে সমান করে চুবড়ি থেকে আলতার পাতা আর বাটি বার করে বসল।

এক-একটা পদ্ম কাটে আর চেয়ে চেয়ে দেখে। বুক পর্যন্ত আমার ঘোমটা-টানা। উঁকি দিয়ে দেখে নাপতিনী বলে, "ওমা, এমন মুখ কি ঢেকে রাখবার গো? এখানে কেউ নেই, ঘোমটা তোল না বাছা, নতুন বৌমা।"

"আছি বই কি আমি। একা বউমানুষকে ছাড়ে কেউ?" বুড়ো ঝি তরুর মা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

"পাহারা দিচ্ছ বৌকে। দাও গো। আজ আর লোক-দেখানো কি সাজ সাজাবো গো? ছমাস পরে এই কচি কচি পা হু'খানায় হাঁটু পর্যন্ত পাখীর ঝাঁক এঁকে দেব?"

অবাক হয়ে গেলাম। ফুলশয্যা জীবনে একবারই আসে। লোক-দেখানো সাজ মানে?

হেলে হুলে নাপতিনী চলে গেল। তরুর মা বলল, "ঢং দেখ মাগীর। গিন্নীর পেয়ারের। হ'বে না? গিন্নীর দাদা আছেন, বামুহন মানুষ বাবা, গড় করি। দিনে এক ভরি আপিম, পঞ্চাশ ছিলিম গ্যাঁজা, এক হাঁড়ি তাড়ি ওঁর বাঁধা বরাদ্দ। তেনার সেবাদাসী ইনি। ঠ্যাকারে পা পড়ে না মাটিতে।"

এঁরা লোক কেমন? ফুলশয্যার দিন থেকে অবাক হচ্ছি আমি।

রাত্রি গভীর হ'ল। নীচের বৈঠকখানায় খ্যামটা নাচ হচ্ছে। আমাদের তত্ত্বের চাকর-চাকরাণীরা একটি করে টাকা আর একখানা করে কাপড় বিদায় পেয়ে খুশি হয়ে চলে গেছে। তত্ত্বের ভাগ শ্বশুর-বাড়ীর আত্মীয়-কুটুম্বেরা পেলেন। লোকজন কমে যেতে শুরু হ'ল।

ভেতরবাড়ীর ঘরে বসে আছি। সামনে টানা-বারান্দা ঝিলমিলি, সার্শী আর চিক দিয়ে ঘেরা। প্রকাণ্ড আমার শ্বশুরবাড়ী। চীনে-পাড়ার গলির অর্ধেকটা জুড়ে আছে বড় বড় দরজা আর ছোট ছোট সিঁড়ির ডালা মেলে। বাব্‌বাঃ, এতই কি চোরা সিঁড়ি আছে গোটা বাড়ীটায়! ছাদে যাওয়া বারণ বউদের। অত্যন্ত সেকেলে ধরনের বাড়ীটার আবহাওয়া।

ছোট গলি কাঁপিয়ে গাড়ী এসে দাঁড়াচ্ছে। কানে আসছে, অমুক বাড়ীর রাজা এলেন, তমুক কম্পানির মুৎসুদ্দি পৌঁছলেন। ছোট ছেলেরা সাটিনের চাপকান, পায়জামা পরে ট্যাসেলদেওয়া টুপী মাথায় বা'রবাড়ী ও অন্দরমহলে ছুটোছুটি করছে। ঝাড় মাথার ওপরে দুলছে, সাতডালের দেওয়ালগিরির আলো কার্পেট ঢাকা মেজের লাল টক্‌টকে গোলাপ আরও লাল করে তুলেছে। সোনার গোলাপপাশ, গোলাপী খিলি অতিথির জন্য হাজির। বেলফুলের গন্ধে, গোলাপের রঙে মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করতে লাগল। ঘুম নেমে এল চোখের পাতায়।

রাত্রি আরও গড়িয়ে গেল। আধোঘুমঘোরে হাত ধরে তুলে খাটের মখমলের বালিশ থেকে মেজের আসনে নামালেন শাশুড়ী। রুপোর প্রকাণ্ড কাঁসিতে ক্ষীর-মুড়কি-মাখা, সকলে খাওয়া-দাওয়া করলেন। কখন দেখি পাশে তিনি, আমার বর।

কোঁচানো সিমলেই ধুতি-চাদর পরা। আঙুলে দশটা আংটি থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। গলায় সোনার হারে চওড়া মাদুলী-গাঁথা। প্রায় প্রত্যেকের গলায় মাদুলী আছে এঁদের বাড়ীতে, ওষুধ-বিষুধ না হ'লেও ঠাকুরের ফুল। ধর্ম-ধর্ম করে সবাই প্রাণ দেন এখানে।

প্রকাণ্ড ঠাকুরঘরে রাধাকৃষ্ণের পঞ্চধাতুর মূর্তি। গুরু-পুরোহিত বাড়ীর রাজা।

আমার স্বামী কিন্তু চমৎকার দেখতে। ক্ষীর-মুড়কি খাবার হাঙ্গামায় আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এয়োরা মিলে ফুলশয্যার আচার-বিচার কিছু করল। কিন্তু, ঘর খালি হ'ল না।

একে একে অনেক মহিলা বসে গেলেন। কেউ বা তাস হাতে, কেউ পানের দোনা নিয়ে। দেওয়ালগিরির আলো তাকিয়ে রইল, ঝাড় নিবিয়ে দেওয়া হ'ল। তবু অসহ্য আলো।

আমাদের শুয়ে পড়তে বলা হ'ল। বাড়ীর সমস্ত কিছু অন্যরকম। কত বিয়ে দেখেছি আমি। স্বামী-স্ত্রীর ঘরে আবার রাত্রে থাকে কে ?

আমি চুপ করে বিছানার একপাশে শুয়ে রইলাম। মধ্যে ফুলের মালা-জড়ানো লাল মখমলের পাশবালিশ। টানা-পাখার জড়ির ঝালরও ফুলে গাঁথা। অন্য লোকেরাও এপাশে ওপাশে মেজের কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ল।

আস্তে একটুক্ষণ পরে হাতে ছোঁয়া লাগল। ভয় পেয়েছিলাম। দেখলাম স্বামীর হাত, বালিশের আড়ালে প্রহরী চোখ এড়িয়ে এসেছে। আমার আঙুলভরা আংটির পাশে আরও একটা আংটি —হীরেপান্নার। স্বামী পরিয়ে দিয়েছেন। মনে হ'ল ওঁর আমাকে ভাল লেগেছে।

আমার স্বামী কি সুন্দর! সাদা পদ্মের মত গায়ের রং ওঁর। পদ্মের কুঁড়ির মত চোখ দু'টি। হাতেল আঙুল চাঁপার কলি। লাল বালিশের পাশে হাতখানা, রাঙাসুতোর ডোরপরা। স্বামীর হাতখানা চেয়ে দেখতে দেখতে চোখ বন্ধ হয়ে এল তন্দ্রায়।

ঘুমের চোখে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। ছেলেবেলা থেকে স্বপ্ন আমি দেখি খুব। স্বপ্ন দেখলাম বিয়ের রাত্রে এই স্বামীকেই। এমন রাত্রে শোবার সাজে নয়—বিয়ের যাত্রা-পোশাকে। হীরে-বসানো তাজ মাথায়, হীরের কণ্ঠি গলায়, কণ্ঠির নীচে মুক্তার মালা, আঙুলে দশটা

আংটি, জড়োয়া গয়না। বুকে জরীর কাবা, পায়ে দিল্লীদার জরীর লপেটা। ভেলভেট-জড়ি-জড়োয়া-মোড়া রাজা।

কানের কাছে এবারে ছোঁয়া পেলাম। চমকে তাকিয়ে দেখি, উনি। আস্তে চাপা গলায় বললেন, "ঘুমিয়েছ ?"

চারপাশে লোক। সবাই শুয়ে পড়েছে। শুধু দেওয়ালে ঠেস দিয়ে খাটের দিকে চোখ রেখে ঝিমোচ্ছে দু'জন আধবুড়ী। তাদের চারপাশে খালি পানের দোনা গড়াগড়ি যাচ্ছে। সারারাত বোধহয় পান খেয়ে কাটাবে। তাস খেলেছে কি না জানি না। আমার লজ্জাবোধ হল এত লোকের কান বাঁচিয়ে উত্তর দিতে। আমি চুপ করে রইলাম।

এবারে উনি বললেন, "তোমার নাম কি ?"

আমার ভারি হাসি পেল। নাম নাকি উনি জানেন না! কথা বলবার ছুতো খালি। তবু হাজার হলেও স্বামীতো। মা বলেছেন, স্বামীর কথা শুনতে হয়। উনি আমাকে কথা বলাতে চান, আমি কথা বলব। বললাম, "মণিমালা।"

"মণিমালা! বাঃ! দেখ, আমি কাল চলে যাব। বি. এ. পাশ করা খুব কঠিন। আমাদের চেনা-জানার মধ্যে কেউ পারেনি। তাই বাবা আমাকে সাহেবী হোস্টেলে রাখবেন। পুজোর সময় আবার দেখা হ'বে। আমাকে ভুলো না।"

"না।"

"আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমাকে ভালবাস না ?... বল, মণিমালা। চুপ করে থেকো না। এক্ষুনি এরা উঠে পড়বে। সারা রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে। বল!"

"হ্যাঁ।"

আনন্দে উনি আমার কাছে আরও সরে আসতে নিলেন। মেহগিনির খাট একটু নড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝিমন্ত বুড়ী দু'টো কটমট করে চেয়ে কড়া সুরে শাসন করল, "কি হচ্ছে ?"

স্বামী মট্‌কা মেরে পড়ে রইলেন। আমি লজ্জায় মরে গেলাম। কিন্তু কেন? বাসরে লোক পাহারা দেয়। ফুলশয্যায় কেউ ঘরে থাকে না। শ্বশুরবাড়ীর নিয়ম-কানুন আলাদা দেখা যাচ্ছে।

আমার ফুলশয্যার গল্প এখানেই শেষ।" ৭ই শ্রাবণ

•

"আজ আমাদের বাড়ীর কথা মনে পড়েছে। খিদিরপুরের সেই বাড়ীখানা। সামনে একটু বাগান, বারান্দা রাস্তার ধারে। পরিবার ছোট। মা বাবা, দুই ভাই, কাকা। আমাদের বাড়ীর আবহাওয়া এই বাড়ী থেকে বহু পৃথক। তাঁরা কতকগুলো ব্যাপারে সেকেলে হ'লেও শ্বশুরবাড়ীর মত এমন কিম্ভূতকিমাকার নন। আধুনিক একটা আবহাওয়া বাড়ীর আনাচে-কানাচে দেখা দিয়েছিল আমার ছোটকাকার কল্যাণে। ছোটকাকা হিন্দু কলেজের সেরা ছেলে ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেন। তখন গর্বে বাবাকে পায় কে? ছোট ভাইএর কথা সকলকে বলে বলে আশা মিটত না তাঁর। ছোটকাকা যা বলতেন, তাই করতেন তিনি। ফলে, বাড়ীর ধরন অন্যরকম হয়ে গেল। বাবা সদর আদালতে মোক্তার ছিলেন। সকাল হ'বার পরে পরেই পাল্কী চড়ে, মাথায় পাগড়ী চড়িয়ে আদালতে যেতেন। পরে ছোটকাকা নিজে বগী হাঁকিয়ে পুরো সাহেবী পোশাকে কাছারীতে বা'র হ'তেন। ছোটকাকার বন্ধুর দলকে লোকে 'ইয়ং বেঙ্গল' বলত।

আমার ভাইরা হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হ'ল। তখন ছোট কাকা জোর করে আমাকেও বীডন সাহেবের স্কুলে পাঠালেন। চারপাশ ঢাকা লম্বা ঘোড়ার গাড়ী আমাকে স্কুলে আনা-নেওয়া করত। স্কুলের গাড়ী সেটা—আরও তিন-চারটি মেয়ে পড়ত। কি সুখেই না দিনগুলো কেটেছিল।

আমার মা আমাকে স্কুলে পড়াবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু বাবার ভয়ে ছোটকাকাকে অমান্য করবার সাহস পেলেন না। মনে

মনে চটে যেতেন তিনি, ছোটকাকাকে ম্লেচ্ছ বলতেন। কিন্তু, বাবার তখন ছোটকাকার উপর অন্ধ বিশ্বাস ছিল। সাহেব সুবোর গা ঘেঁষে না চললে উন্নতি নেই, তিনি ধরে নিয়েছিলেন। কাজেই আমাদের ইংরেজী লেখাপড়ার ব্যবস্থা হ'ল। ঘরের আসবাবপত্রও কাকা সাহেবী কেতায় করালেন।

কাকার কলেজে পড়বার সময়ে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরে শান্তিপুরে ডুরে-পরা কাকীমা ঘরবসত করতে এসেছিলেন। আঁচলে রুপোর শিকলিতে চাবি-ঝোলানো, পায়ে ঝাঁঝর মল। বাড়ীতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁজমল, চাবির শিকলি সব খুলে ফেলতে হ'ল। কাকার বৌ পছন্দ হয়নি, বৌ গেঁয়ো মূর্খ বলে। ফিরিঙ্গি মেম রেখে বৌএর লেখাপড়ার কথা হ'তে লাগল। এর মধ্যে কাকীমা আম কাঁঠালের সময় বাপের বাড়ী গেলেন, আর ভেদবমি হয়ে মারা গেলেন।

কাকাকে আবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফল হ'ল না। সেদিনকার কথা মনে আছে। সোনালী-পাড় স্বচ্ছ আয়নায় দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে কাকা দু-হাতে বুরুশ ধরে আলবার্ট-ফ্যাশানে চুল ফেরাচ্ছেন। মার্বেলের টেবিলের উপর ছড়িখানা রাখা। আমি বসে আছি ধন্না দিয়ে। এক্ষুনি কাকা রুমালে ল্যাভেণ্ডার মাখবেন, আমিও ভাগ পাব।

বাবা ঘরে ঢুকলেন, "যতীশ শোন, কুমোরটুলির গাঙ্গুলীর মেয়েটি সুন্দরী। ওখানেই বিয়ে-টা কর। গাঙ্গুলী মশাইর লোক হাঁটাহাঁটি করছে।"

কাকা বুরুশ রেখে ধীরে-সুস্থে পমেটমের শিশির মুখ বন্ধ করে বললেন, "না বলে দিন।"

"মানে?"

"মানে আমি বিয়ে করবো না। আপনাদের পছন্দে আমার আর আস্থা নেই। দরকার হ'লে নিজেই বেছে নেব।" কাকা

ছড়ি তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ল্যাভেণ্ডার-মাখা হ'ল না। বাবা নিজের মনে মাথা চুলকে 'ছি-ছি' বলে মায়ের কাছে গেলেন।

আমার তের বছর বয়সে জোড়াসাঁকোর বাঁড়ুজ্যে বাড়ীর ছেলে শ্যামবাবুর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কাকা ভেঙে দিলেন। তিনি বললেন, "ছেলের বিত্তে নেই। বারোয়ারী পুজো, পাঁচালীর দল আর খেমটা নাচ নিয়ে থাকে। সিদ্ধি, চরস, মদ ছাড়া দিন চলে না তার। ছেড়ে দাও সম্বন্ধ। না-হয় বিষয়-আশয় আছেই। মেয়েটাকে জলে ফেলে দিও না। কলেজে পড়ছে, এমন ছেলে ছাড়া বিয়ে দেব না মণির।"

বাবা চুপ করে গেলেন। মা গজ্ গজ্ করতে লাগলেন। মা অষ্টপ্রহর পানের সরঞ্জাম নিয়ে থাকতেন। ঢ্যালা-ঢ্যালা কেয়া খয়ের তৈরী হচ্ছে, চুয়া-পুগর যোগাড় হচ্ছে। নিজের হাতে মিঠে পান গুনে গুনে সেজে পানের বাটা ভরে ভরে রাখছেন। কাশীর সুর্তির গুলি দিয়ে মুখে ফেলছেন আর পচর্-পচর্ পিকদানীর মধ্যে পিক ঢালছেন।

পিক্ ফেলে বললেন, "ছোটঠাকুরের নজর সাহেব ছাড়া উঠবে না। ততদিনে মেয়ে তোমার কুড়ি বছরের বুড়ী হয়ে বাপ পিতামোকে স্বগ্গে তুলবে।"

বাবা জিভ কেটে বললেন, "ছি, ছি! এক বছরের মধ্যেই ভাল সম্বন্ধ খুঁজে আনব। বুড়ী হ'তে দিলে তো। তবে, মেয়েটা লেখাপড়া শিখছে, যতীশের মত একটা ডেপুটি কি মুন্সেফ জামাই যদি পাই, দেখা যাক না। বাঁড়ুজ্যের ছেলের ধার নেই।"

দিন যেতে লাগল, কাকারও সাহেবিয়ানা বাড়তে লাগল ক্রমে ক্রমে। এর মধ্যে এই বাড়ীর সম্বন্ধ নিয়ে ঘটক গেল একদিন আমাদের বাড়ী।

হাতে বাঁকা বাঁশের লাঠি, গায়ে লুই জড়ানো ঘটক শামুক

থেকে একটিপ করে নস্য নিচ্ছে আর শ্বশুরমশায়ের টাকা, বংশ, পাত্রের রূপ-বিদ্যার প্রশংসা করছে। বাবা আলবোলার নল মুখে চেপে একমনে শুনছেন। কাকাকে ডাকা হয়েছে। তিনি পেণ্টুলেন-কোর্তার সাজে এসে ফরাসের পাশে গদি-আঁটা চেয়ারে বসলেন। ঘটক হেঁ—হেঁ করে হেসে বলল, "ছোট সায়েবের নামযশে গগন ফাটে! শুনছি নাকি সায়েবরা আপনায় বেলাত পেঠাবে।"

ছোটকাকা রাশভারি চালে বললেন, "কাজের কথা বলুন।"

"এঁজ্ঞে, তা বেলাত থেকে ফিরে প্রাচ্চিত্তির করলেই জাতে উঠবেন। আপনাদের মেয়ের রূপের কথা শুনে মুখুজ্জে বাবুর ইচ্ছা হয়েছে ছোটছেলের সঙ্গে বে' দেন। মুখুজ্জেবাবুর কথা সবি তো জানেন। রাজতুল্যি মানুষ।"

বৈঠকখানার জানালার পরে দোতলার বারান্দা। খড়খড়ির আড়াল থেকে আমি দেখছিলাম মজা। কাকা বললেন, "ছেলেটি?"

"সে বলতে হবেনি। এফ-এ পাশ করে বি-এ পড়ে। বড় মানুষের ঘরে এত লেখাপড়া জানা ছেলে পাওয়া যায় না।"

বাবা সোৎসাহে কাকাকে বললেন, "কেমন যতীশ, এমনি পাত্রই তুমি চাইছিলে, না? বুঝলেন দেবীদাস ঠাকুর, আমার সন্তান নামেই। আসলে কাকাই মণি-মায়ের অভিভাবক।"

কাকা উজ্জ্বলমুখে বললেন, "মুখুজ্জেমশাই নামকরা বনেদী বড়লোক। ছেলেটিও বিদ্বান।"

"তবে আর কি? শুভ আষাঢ়েই চার হাত এক হোক। আমরা 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ'। হেঃ, হেঃ।" উৎসাহের আবেগে ঘটকমশাই ঘন ঘন নস্য নিতে লাগলেন। একটু দম ফেলে আবার শুরু করলেন, "বুঝলেন ছোটসায়েব, ছেলের রূপ কি! যেন মৌর ছাড়া কার্তিক। আহা—হা! ঘর আলো হয়ে যায়।"

আমার বুকের মধ্যে দুরু দুরু করতে লাগল। পনরোয় পা দিয়েছি দু'দিন হ'ল। স্কুলে পড়াশোনা করি, ভালও লাগে। কিন্তু, এমন বর পেলে ছাড়ে কে? ওঁরা যদি পড়তে দেন তবে চন্দ্রমুখী-কাদম্বিনীর মত আমিও বি-এ পাশ করব।

ছোটকাকা খুশি হয়ে বললেন, "এমনি পাত্রই চাইছিলাম। মেয়েকে বীডন সাহেবের স্কুলে পড়াচ্ছি কি না, শিক্ষিত পাত্রেরই দরকার।"

ঘটক দেবীদাস ঠাকুর হাত জোড় করল, "একটা কথা, ছোটসায়েব, রাখতে হ'বে। এনারা বড়ই বনেদী, প্রাচীন বংশ। তাতে আচার-নিয়ম ধর্মো নিয়ে খুঁতখুঁতে একটু। মেয়ে সায়েবের স্কুলে পড়েছে, জানলে বিয়ে হ'বে না। কথাটা চেপে যেতে হ'বে।"

ছোটকাকার মুখ লাল হয়ে উঠল, "মেয়ের শিক্ষার মূল্য যেখানে হয় না, সেখানে আমরা বিয়ে দিই না। আপনি আসুন।"

দেবীদাস ঠাকুর আমতা-আমতা করে অবাক হয়ে বললেন, "তা—তা, ছেলেটি আধুনিক। এমন ছেলে হাতছাড়া করবেন না। মেয়ে আপনাদের সোনার খাটে গা রুপোর খাটে পা দিয়ে থাকবে। টাকার সীমে নেই।"

"সেই বাড়ীতে মেয়ে থাকতে পারবে না।" কাকার বগী-গাড়ী বাইরে জোতা ছিল। উঠে চলে গেলেন তিনি। আমারও মন খারাপ হ'য়ে গেল। অতিকষ্টে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি কাকার দয়ায়। আবার ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে বসে থাকার দিনগুলো ফিরে আসবে? আমি ওই বাড়ী যেতে চাই না। কাকা ঠিক বলেছেন, কাকা কত বোঝেন!

সে-বার নিরাশ হয়ে দেবীদাস ঘটক ফিরে গেল। আমিও বিতৃষ্ণ হয়ে রইলাম। ১০ই শ্রাবণ

"পড়াশোনা ঘুচে গেছে। বাক্সের মধ্যে বই লুকানো থাকে। মাঝে মাঝে লুকিয়ে পড়ি। তাও সময় হয় না। মা বলে দিয়েছেন এঁরা যেন না জানেন আমার স্কুলে পড়ার কথা। কেন যে এমন ঘরে বিয়ে দিলেন? টাকা দিয়ে কি হয়? বিয়ের আগে ভেবেছিলাম কত সুখ হ'বে এমন বড়লোকের বাড়ী পড়ে? গাড়ী চড়ে বেড়াবো, সোনাদানা পরে সাজবো। তা, বাড়ীর চৌকাঠের বাইরে পা দেওয়া বারণ। সোনা এতই বেশী যে শরীরে ভার সয় না। একখানা খুলে রাখবার উপায় নেই। কথা বলি কার সঙ্গে? খাতার পাতায় বাজে কথা লিখে সময় কাটাই।

এই মোটা ডায়েরীর খাতাখানা আমার একমাত্র বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাকা ডায়েরী লিখতে শিখিয়েছিলেন চোদ্দ বছর বয়সে। বড়দিনের দিন কাকা চকচকে ছাপা, ঝকঝকে বাঁধানো একখানা খাতা দিয়ে বলেছিলেন, "মনের কথা লিখে মনের ভার হাল্কা করতে শেখ, মণি। বিলেতে মেয়েরা নিয়মিত ডায়েরী রাখে। এ দেশে জন্মেছিস মেয়ে হয়ে, কথা বলার লোক পাবি না।"

কাকা আমাকে স্কুলে দিয়েছিলেন মা বাবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে। কাকা আমাকে এত সেকেলে বাড়ী বিয়ে দিতে মত দেন নি। সেই কাকা পর হয়ে গেলেন। আর আমিও এসে পড়লাম আবার এখানে। সুপাত্রের লোভ; ঐশ্বর্যের লোভ মা-বাবা ছাড়তে পারলেন না।

তা, এদের টাকা আছে বটে। বিরাট বাড়ী, বিরাট গাড়ী, বিরাট কারবার। গোটা চীনে-পাড়ায় আমার শ্বশুর টাকা ধার দেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে সাদাকালো পোশাক-পরা চীনের দল আবছা অন্ধকারে যাতায়াত করে। তেতলার মধ্যেই আমার বাসা। গোটা পাঁচেক ঝি পাহারা দেয়। ষোল বছর বয়সেই এমন পরদার মধ্যে আটকে পড়লাম! ভবিষ্যতে কি হবে আমার?

আচ্ছা, বি-এ পরীক্ষার পড়া কি এতই বেশী যে, আমার স্বামী শনি-রবিবারে বাড়ী আসতে পারেন না?" ১২ই শ্রাবণ

"লেখা পাতাগুলো পড়তে যেয়ে দেখি আমার এখানে শেষ পর্যন্ত বিয়ে কেন হল, লেখা হয়নি। অবশ্য লিখেই বা করব কি? নিজের মনে লিখে যাই। ভাল লাগে কিন্তু। 'মনে হয়, কোনদিন স্বামীকে না হয় দেখাব। কথা বলতে লজ্জা করে। লেখা মনের কথা দেখাতে লজ্জা করবে না। উনিও জানতে পারবেন আমার জীবনী।

কাকা ঠিকই বলেছিলেন। বাংলার মেয়ে হয়ে জন্মানো সুখের নয়। কি পরাধীন জীবন!

আচ্ছা, কাকা কি মেমকে নিয়ে সুখী হয়েছেন? চৌরঙ্গীতে বাড়ী ভাড়া করে আছেন তিনি। কাকা কি করে আমাদের সকলকে ভুলে গেছেন? মা বলেন মেমের মোহে। মেম তো বিশ্রী দেখতে। ফরসা রং ছাড়া কিছুই নেই। দাঁতগুলো মুলোর মত, মাগো মা! লাল রং মেখে পুরু-পুরু ঠোঁট দুখানা কি করে রাখে! গলায় আবার পোষা কুকুরের মত কাল একটা ভেলভেটের টুকরো বাঁধে। বাঙালী মেয়ে মেমের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। কাকা কি দেখে মেম ভালবাসেন?

মা-বাবার সঙ্গে যখন বচসা হচ্ছিল, আমি সামনের বারান্দায় যেয়ে মেম দেখেছি। একখানা ব্রুহাম গাড়ীর মধ্যে জানালা খুলে অসভ্যের মত বসে রয়েছে। লেখাপড়া দেখে যদি কাকা ভুলবেন তা'হলে মেমের ধরন-ধারণ এমন জংলীপনা কেন?

বাবা রাগে কাঁপছেন, "এমন কাজ করলে তুমি, সনাতন মুখুজ্জের ব্যাটা হয়ে, ছি, ছি! পিতৃপুরুষ জলগণ্ডূষ পাবে না তোমার হাতে? বিলাত যাওয়ার আগেই মেম জোটালে তুমি! তোমার উপরে বড় গর্ব ছিল, কত আশা ছিল"—বাবার গলা ধরে গেল!

চিরদিনের দাপটধারী কাকা কেমন মিন্-মিন্ করে বলছেন, "আশা ভঙ্গ আপনার হবে কেন? আমি আপনার ভাই-ই থাকব। কত লোক মেম নিয়ে ঘর করে না? বাড়ীতে বাথরুম-টুম বানিয়ে নিলেই যেমন ছিল, তেমনি চলবে।" —"না চলবে না।" চমকে দেখি

পাশের ঘরের কাঠের পরদার আড়াল থেকে মা চলে এসেছেন। কস্তা পেড়ে শাড়ীর ঘোমটা মাথায় টানা। "অনেক খৃস্টানী সহ্য করেছি, মেলেচ্ছ বৌ নিয়ে ঘর করতে পারবো না। আমার বাবা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, আমার বাড়ী জলস্পর্শ করেন না। মেমের সঙ্গে এক বাড়ী থাকলে আমার মুখ দেখবেন না। দ্যাওরঠাকুর কি ভুলে গেছেন আমাদের ধোবা-নাপিত বন্ধ হ'বে, মণির বিয়ে হবে না?" বাবা চুপ করে রইলেন। কাকা দু'জনের দিকে চেয়ে বেশ তেজের সঙ্গে বললেন, "বেশ। আপনাদের আবার সমাজ! ফিরিঙ্গী উপপত্নী রাখলে ধোবা-নাপিত বন্ধ হয় না আপনাদের! পছন্দ করে আইন মত বিয়ে করলে সেটা অপরাধ? থাকুন আপনারা জগা-খিচুড়ি হয়ে। আমি চললাম। ভুলবেন না কোনদিন আমি থাকতেই এসেছিলাম।"

বুট আর স্টিক্ মাটিতে ঠুকে কাকা গাড়ীতে উঠলেন। রাস্তা কাঁপিয়ে ব্রুহাম চলে গেল। কাকার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

কাকা চলে গেলে বাবা একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। কাকা মেম বিয়ে করেছেন শুনলে আমার বিয়ে ঠেকে যাবার ভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। পাত্রখোঁজা চলল। এমন সময়ে দেবীদাস ঠাকুর আবার দেখা দিলেন।

"মেয়ের এখনও পাত্রও পাননি, মুখুটি মশায়? পনরো পেরিয়ে ষোলোয় পা দিল কন্যে। বয়সটা বড়ই বেশী হয়ে গেছে। যাক, পাত্তরও কুড়ির সোমত্থ যোয়ান।"

বাবা বিমর্ষভাবে প্রশ্ন করলেন, "কার ছেলে?"

"আপনার ভাগ্যি ভাল। মুখুজ্জে মশায়ের ছেলের এখনও বে' হয়নি। আপনার কন্যের সঙ্গে কুষ্টির মিল রাজযোটক। লাখে এমনটি মেলে। মেয়ের রূপের কথা শুনে, বিশেষতঃ কুষ্টির মিল দেখে মুখুজ্জে মশায় এখনও রাজী আছেন।"

বাবা বললেন, "মুখুজ্জে মশায়ের সঙ্গে কুটুম্বিতা আমার মত

মানুষের ভাগ্য। সে কুলাঙ্গার বাধা না দিলে এতদিন তো হয়েই যেত। ওর মতামত নিয়ে ঠকেছি। মুখুজ্জে মশায় স্কুলে-পড়ার কথা জেনেছেন কি ?"

দেবীদাস ঠাকুর জিভ কেটে নস্য নিল, "বিষ্ণু, বিষ্ণু ! অমন কাঁচা কাজ দেবীদাস ঠাকুর করে না। মেয়ে লেখাপড়া কিছু করেছে কাকার কাছে, তাইমাত্র বলেছিলাম। এমন ঘর-বর কোথায় মেলে ? বৈশাখেই শুভকম্মো হয়ে যাক।"

কাকা মন্দ, কাকার বুদ্ধি শুভ নয়। বিতৃষ্ণ মনকে বোঝালাম। আমার ভাগ্য ভালো, এমন ঘর-বর পাচ্ছি।

বৈশাখেই শুভকর্ম হয়ে গেল।

নহবৎ বাজল। বালুচরী শাড়ী এল। ভিয়েন বসল। যথাসাধ্য বাবা খরচপত্র করলেন। ওধারে শ্বশুরমশাই রুপোর ঘড়া সামাজিক করে শহরে তোলপাড় তুললেন।

একমাইল শোভাযাত্রা করে, গড়ের বাজনা বাজিয়ে বর এলেন। কানে তালা লেগে গেল সকলের. বাজনা-বাজির শব্দে। আতস বাজির আভায় আকাশ আলো হয়েছে। আমাদের খাঁচার পাখীগুলো ডানা ঝাপটাতে লাগল। স্বপ্নের মত আমার বিয়ে হয়ে গেল।

ছাঁদনা-তলায় চারটি কলাগাছের মধ্যে আল্পনা-কাটা পিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। শাঁখ-উলুর শব্দ, গ্যাসের আলোর মধ্যে শুভদৃষ্টি হ'লো। কি সুন্দর লোকটি !

আচ্ছা, এরা আমাকে স্বামীর সঙ্গে মিশতে দেয় না কেন ? চিঠিপত্র লেখাও বারণ : শুধু কি পড়ার ক্ষতির জন্যে ?" ১৮ই শ্রাবণ

"পুজো এসে গেল। বাড়ীতে খুব ধুম। কুমোরটুলীতে কৃষ্ণনগরের কারিকর ফরমাশ মত প্রতিমা গড়তে শুরু করেছে। শ্বশুর-বাড়ীর প্রতিমা এঅঞ্চলে সকলের চেয়ে বড় হয়, শুনলাম।

জড়োয়া গয়নার বায়না নিচ্ছে জহুরী। ঢাকাই আর শান্তিপুরী

কাপুড়ে মহাজনেরা কাপড় বিক্রির আশায় নীচের মহলে মুন্সী মশাইএর কাছে ঘোরাঘুরি করছে। চাকর-বাকরদের নূতন তকমা, উর্দ্দি, কাপড়ের বায়না গেছে।

রাস্তায় ফিরিওয়ালা ঘুরছে, শাঁখা ইত্যাদি ডেকে ডেকে। দর্জ্জিরা ছেলেদের পোশাক সেধে ফিরছে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায়ের ফর্দ্দ তৈরি হচ্ছে।

মাথাঘষার নূতন মশলা; বেলোয়ারী চুড়ি নিয়ে দাসীরা মাতামাতি করছে। দাসীদলের কর্ত্রী তরু-ঝি। গলায় সোনার দানা, বিয়ের সময়ে তখন গরদ পরে বেড়াত। দুর্গামণ্ডার হুকুম গেছে ময়রার দোকানে। শাশুড়ী আমার কথা কম বলেন। ফ্যাকাসে চেহারা, বড় বড় চোখ। ঢাকাই ফিনফিনে শাড়ী পরে নিজের মহলে চুপচাপ বসে কড়ি খেলেন। কানে চৌদান দোলে, গলায় চিক, হাতে যশম কিন্তু মুখে হাসি নেই। বড়জা সূচ-সুতা উল-প্যাটার্ণ নিয়ে মত্ত। ননদদের বিয়ে হয়ে গেছে সমান ঘরে। খুড়শাশুড়ী ইত্যাদি নিয়ে অনেক লোক। কিন্তু, আমি একা।

নাপতিনী রোজ আসে চুবড়ি কাঁখে। সাজ-পোশাক তেমনি। আমার সঙ্গে ভাব করতে ব্যস্ত। পা ঘষে পুরানো আলতা ধুয়ে নূতন আলতা পরায় ও। সঙ্গে সঙ্গে বকবক করে। শাশুড়ী ছাড়া কেউ ওকে দেখতে পারেন না। ও নাকি আমার শাশুড়ীর দাদার রক্ষিতা। না জানি শাশুড়ীর বাপের বাড়ীর লোকে কত ইতর।

পূজা আসবার সঙ্গে সঙ্গে ধম্মোকম্মোর ব্যাপার বেড়ে গেল। আমার তো প্রাণ যাবার যোগাড়। এতদিন পরে ঠাকুরঘরে এরা আমাকে ডেকে নিয়ে পুজোর কাজকম্ম শেখাচ্ছে। বাবাঃ, পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই। নিত্য পুজোর যোগাড় নয়তো এক মহা ব্যাপার। আমাকে অবশ্য দেখিয়ে শুনিয়ে তৈরি করে নেবার উৎসাহ সকলেরই।

ঠাকুরঘরের কর্ত্রী বিধবা পিসশাশুড়ী। থান কাপড়, চূড়ো করে

বাঁধা চুল, হাতে তর্পণের আংটি। সাদা ধবধবে পাথরের ঠাকুরঘরে শ্বেত পাথরের চৌকির ওপর সোনার সিংহাসনে, রাধাকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের নানারঙের রেশমী কাপড় পরানো হয়, খোলা হয়। সাজ-পোশাকের বাক্সের চাবী পিসশাশুড়ীর হাতে। সর্বাঙ্গে সোনার গয়না। সঙ্গে এক এক অঙ্গে জড়োয়া একখানা করে। শ্রীকৃষ্ণের হাতে সোনার বাঁশী, টানা-টানা সোনার চোখে কষ্টিপাথরের মণি। দেখলে ভয় হয়। রাধিকা কৃষ্ণের চেয়ে অনেকটা ছোট —নির্জীব চেহারা। ঠাকুরঘর থেকে একটা সাঁকো বাড়ীর দোতলাটা আর একটি অংশের সঙ্গে যোগ করেছে। সেখানে ছোট দু'খানা ঘর, সামনে একফালি খোলা ছাদ। একখানা ঘরে তৈজসপত্র, তরকারি ইত্যাদি থাকে, বাসন-কোসন, কাঁসর-ঘণ্টা। অন্যখানায় রান্না হয় ঠাকুরভোগ। টিকিতে ফুল বাঁধা উড়ে ঠাকুর এসে রান্না করে দেয়। বারটায় শঙ্খঘণ্টার শব্দে বাড়ী কাঁপিয়ে ঠাকুরভোগ হয়। সন্ধ্যায় শীতল। জলখাবারের বামনী বঁটি পেতে রাজ্যের ফল কাটে, বাঁধা-বরাদ্দ ময়রা সন্দেশ দিয়ে যায়। সেই শীতলের প্রসাদ বিধবারা খান।

ঠাকুরের সাজ-নৈবেদ্য বাড়ীর মেয়েদের সাজাতে হয়। রুপোর বাঁট সাদা চামর মেয়েরা ঢোলায় পুজো ও শীতলের সময়। মালী ফুল এনে দেয়। মালা গাঁথতে হয় নিজেদের। সারাদিন কতকগুলি লোককে ঠাকুর সেবার আয়োজন নিয়ে থাকতে হয় লেগে।

খিদিরপুরের বাড়ীতে পুজো-আচ্চার ঘটা দেখিনি। ভাঁড়ার-ঘরে পিতলের সিংহাসনে মায়ের লক্ষ্মী পাতা ছিল। প্রত্যহ স্নানের পরে লক্ষ্মীপুজো করে পাঁচালী পড়ে উনি জলগ্রহণ করতেন। বৃহস্পতিবার একটু বিশেষ ধরনে পুজো হত। মা একখানা তসর পরতেন। প্রসাদ কাঁচা হলেও বেশি-বেশি দেওয়া হত। বাড়ীতে বৃহস্পতিবার কেউ এলে লক্ষ্মীর প্রসাদ পেত। কিন্তু, তেমন আয়োজন সামান্য। শ্বশুরবাড়ীর রাজসিকতা আমি কল্পনা করতে পারিনি।

কি আনন্দ ঠাকুরকে পুতুল বানিয়ে পুতুল খেলা করে ? শীতকালে লেপ, বর্ষায় ছাতা, গ্রীষ্মে কোঁচানো ধুতি, উড়ুনী। বাড়ীর মধ্যে মশা হ'ল। ঠাকুরের খাটে নেটের মশারী টাঙানো হ'ল। বছরে দু'বার নতুন সাজপোশাক করা হয়। একটু বিবর্ণ হ'লেই পুরনো পোশাকের গঙ্গাসাৎ করা নিয়ম। রাধাকৃষ্ণের পোশাক দেখলে লোভ হয়। ছি, ছি, কি বলছি !

প্রত্যেকটি উৎসব রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। দোল, ঝুলন, চন্দন-যাত্রা, বারমাসে তের পার্বণ। সংক্রান্তি, মাসপয়লা, নবান্ন, পৌষপার্বণ ইত্যাদি উপলক্ষেও বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা। শুচিবাই, নিয়ম-কানুন শিখবার মত।

আমি অবাক হয়ে যেতাম। রক্তমাংসের মানুষের যেমন সেবা করতে হয়, তেমনি করে এঁরা পাথরের ঠাকুরের সেবা করে যান দিনের পর দিন। এঁরা কি জানেন না পাথরে মানুষের মন থাকে না ! পাথর শুধু পাথর।

একেশ্বরবাদ নিয়ে আমাদের সময়ে কত গবেষণা হ'ত। রামমোহন রায় বলে একজন রাজা ছিলেন। তিনি নাকি হিন্দু-শাস্ত্র খুলে পৌত্তলিকতাবাদ খণ্ডন করেছিলেন। কাকাকে সেই সব যুক্তি নিয়ে উত্তেজিত তর্ক করতে শুনেছি। স্কুলেও শুনতাম ঈশ্বর এক, খণ্ড খণ্ড করে তাঁকে দেখ না।

মনের কথা যদি এঁরা শুনতেন আমার, তাহলে হয়তো বাড়ীর বার করে দিতেন। সুতরাং গরদের শাড়ী পরে, খালি গায়ে বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে পুজোর কাজ আমাকে শিখতে হ'ত।

প্রকাণ্ড রুপোর থালায় নৈবেদ্য সাজানো, কোথায় কলা, কোথায় ফল মিষ্টি, কোথায় তাম্বুল বসাতে হবে পিসশাশুড়ী হাতে ধরে দেখিয়ে দিতেন। খুড়শাশুড়ী চন্দন-ঘষা, দূর্বা-বাছা, বিল্বদল, তুলসীপত্র-বিন্যাস শেখাতেন। গঙ্গাজলের পাউলী-ঘটি হাতের কাছে থাকত। একটা কাজ সেরে হাত ধুয়ে অন্য কাজে হাত লাগাতাম।

সোনার সিংহাসনে বিগ্রহ বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত। হায়, এরা কি জানে না ঐ চোখে কখনও স্পন্দন আসে না ? এরা কি জানে না ঐ সুন্দর মূর্ত্তির বুকে প্রাণ নেই ?

আনাড়ি হাতে কত ভুল করে ফেলতাম। বেলপাতা ত্রিপত্র বাছতে দ্বিপত্র বাছতাম। দূর্বার সঙ্গে আগাছা থাকত। চন্দন মিহি মসৃণ হ'ত না।

খুড়শাশুড়ী মুখ বেঁকিয়ে বল্লেন, "মণি বৌমা, তোমার মা কি বাছা কাজকর্ম কিছুই শেখায়নি ? বলি, আমাদের মত ন' বছরের কনে-বৌটি হয়ে ঢোকনি তো। পনরো-ষোল বছরের ধিঙি তুমি, বাছা। কি করতে এতদিন বাপের ঘরে ?"

রামবাগানের কাকীমা বললেন, "ওগো, মণি বৌমা যে ওনার সাহেব কাকার কাছে লিখিপড়ি করত। গুরুদেব এই মেয়ে আনতে আদেশ দিলেন বলেই না ধাড়ী বৌ মুখুজ্জে-বাড়ী পা দিতে পারল।"

মাথা নামিয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। হাতে চন্দনকাঠ চন্দন-পাটার ওপরে থেমে গেল আপনা থেকেই। দুই বছর আগে বলা কাকার কথাগুলো মনে পড়ল: "ওই বাড়ীতে মেয়ে থাকতে পারবে না।"

পিসশাশুড়ী আমার দিকে চেয়ে একটু কোমল স্বরে বললেন, "চন্দনঘষা যা হয়েছে, ওতেই হবে। তুমি এধারে এস। মালার ফুলগুলো বেছে বেছে রাখ। মালীটার কাণ্ডজ্ঞান নেই, যা তা ফুল ডালার মধ্যে আনে।"

পিসশাশুড়ীর কাছে বসলাম। গলা নামিয়ে তিনি বললেন, "এসমস্ত কথা কত শুনতে হয়েছে আমাদের শ্বশুরবাড়ী। তুমি শিখে-পড়ে তৈরি হয়ে নাও। কেউ তোমার খুঁত ধরতে পারবে না।"

পিসশাশুড়ী বোঝালেন, "তোমার ভাগ্যি, মণি বৌমা। এবারে তোমার দেহ শুদ্ধ হ'বে। এ তারই হাতে খড়ি।"

তাঁর কথার মধ্যে কি যেন ইঙ্গিত? বুঝতে পারলাম না। শাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলার নিয়ম নেই। চুপ করে রইলাম।" ১০ই ভাদ্র

"আজ বুড়ো-ঝি তরুর মা কেটে কেটে বলল, "ওগো মণি-বৌমা, আর মুখ ভার করে থেকো না গো। আর কটাদিন মাত্তর। পুজোর পরে দাদাবাবু বাড়ী আসবেন। তবে বাছা, তার আগে একটুখানি কষ্ট করতে হবে তোমাকে।"

ঝি-এর সঙ্গে কথা কওয়া নূতন বৌয়ের রীতি নয়। কিন্তু কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছি আমাকে কেন্দ্র করে একটা চুপিচুপি কথার ধারা। তারা আমাকে দেখলেই চুপ করে, কিন্তু, কেমন করে যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত চায়। বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। জানি না কেন।

আমার জন্য বিশেষ করে নূতন শাড়ী-গয়নার ফরমাশ দেওয়া হয়েছে। পুজোর সময় পরব বলে। সে কি আমার স্বামীর জন্যে? তিনি তো পুজোর মধ্যে আসবেন না। তাছাড়া চুপিচুপি কথা কেন?

মরীয়া হয়ে তরু-ঝিকে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম চাপা গলায়, "কি কষ্ট করতে হ'বে?"

ঝি কেমন করে যেন গা দুলিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেল বলতে বলতে, "মাগো, সে সব আমি কইতে নারব। বনেদী বাড়ীর সব রীত বিচিত্তির।"

কি রহস্য প্রকাণ্ড বাড়ীর কোণে কোণে সঞ্চিত হয়ে আছে জানি না। কোথায় এসে পড়লাম? কাকা আমাকে স্কুলে দিয়েছিলেন মা-বাবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে। সেই কাকা মেম বিয়ে করে পর হয়ে গেলেন। আর সুপাত্র পেয়ে মা-বাবা আমাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। আমার সে স্বচ্ছন্দ জীবন গেল কোথায়? এরা আমাকে পুতুলের মত সাজিয়ে রেখে পুতুলের মত খেলা করে।" ২৬শে ভাদ্র

পুতুলের মত পুতুল খেলা করে! পুতুল লইয়া তাহারা খেলা করিত। শ্বেত-প্রস্তরের হর্ম্যে সুখাসনে আসীন যে বিগ্রহ কোনদিন সেখানে প্রাণের স্পন্দন ধ্বনিত হয় নাই। উৎপীড়িতের অশ্রুপ্লাবনে সেই পাষাণ চক্ষের পল্লব মুহূর্তের জন্যেও সিক্ত হয় নাই। প্রাণহীন প্রতিমার পাদপীঠে চিরদিন মৃত্যু জীবনকে হত্যা করিয়াছে, তবু নিস্পৃহ দেবচিত্তে বিক্ষোভ জাগে নাই। পুতুলকে কেন্দ্র করিয়া খেলার মধ্যে জীবনের চঞ্চল ধারাকে সংহত করিয়া বনেদী মুখোপাধ্যায়-বাটী দিন কাটাইবার বিলাসে মগ্ন। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ হইতে যে কিশোরী আসিয়াছিল, বিমূঢ় বোধ করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু, ধর্মের মধ্যে রহস্যটি কি?

কেয়া সোম বর্তমানে ফিরিয়া আসিল। বিংশ শতাব্দীর কোলাহল মুখর একটি প্রহর।

ভাবী সঙ্গীতকার বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিলেন, "ছি-ছি, বাংলাদেশের দশা হয়েছে কি? একটা গল্প পাচ্ছি না মনোমত। বাংলার মাটিতে কখনও নাটক সৃষ্টি হয় না। মিন্‌মিনে জোলো সুর গেঁথে গেঁথে ক্লান্ত হয়ে গেছি।"

কেয়া সোমের চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল একটি রক্তবিন্দু। না, চোখের ভুল। লাল পাথরের কুচির উপর সূর্যের শেষ আলো। নাটক নাই। বাংলার শ্যাম ভূমিশ্রী নাটকীয় উপাদান বক্ষে ধরে না। অতি সাধারণ হাতা-বেড়ীর জীবন মেয়েদের, পুরুষের জীবন তো কেরানীশালা।

গল্প কোথায়? সিনেমার আয়োজন তৈরি, কাহিনী নাই। প্রকাণ্ড বাড়ীর প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট। সাহেবী পোশাকধারী সওদাগরের পণ্য-অফিস, খবরের কাগজ ইত্যাদির মেলা। প্রাচীন একশো বছরের ভিত নূতন স্থাপত্য সংস্কারের কৃপায় এখনও নবীন। কিন্তু এখানে বসিয়া পেয়ালার পর পেয়ালা চা নিঃশেষ করিলেও গল্পের দেখা মিলিবে না।

সৌম্যেন সেন বিরক্তভরে বলিয়া উঠিলেন, "নিজেদের মধ্যে এতজন লেখক, অথচ একটা গল্প কেউ লিখে দিতে পারছেন না ?"

সাহিত্যিক-ডিরেক্টর বলিলেন, "গল্প আসবে কোথা থেকে ? চার পাশে হয় কাস্তে-খস্তা সাহিত্য, নয় যৌনতথ্যের কারসাজি। এবাড়ীতে বসে তাসখেলা চলে, গল্প তৈরি করা চলে না।"

সনাতন আবার চায়ের পাত্র সরবরাহ করিল। ছাদের ক্যান্টিনের চা, প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হয় না। মাসের শেষে বিল আসে। অ্যাস্‌বেস্টসের ছাউনীর নীচে প্রখর আলো জ্বলিয়া উঠিল। সনাতন এক প্লেট প্লাম্‌কেকের খণ্ডিত অংশ বেতের টেবিলে সাজাইয়া দিল।

ক্যামেরাম্যান বলিলেন, "কয়েকটা শট্ এই বারান্দায় নেব। ওই আকাশ আর বাড়ীর চূড়োগুলো চমৎকার এসে যাবে। আঃ !"

চিত্রনাট্য রচয়িতা হাসিয়া উঠিলেন, "শোন কথা! আরে মশাই, আপনার ওসব শট্ গল্পে খাটবে কি না ঠিক না হ'লে শটের কথা ওঠে কি করে ?"

আর্ট ডিরেক্টর বলিলেন, "তাইতো। গল্পই পাওয়া যাচ্ছে না। সময় অযথা নষ্ট।"

রেস্তদার ডিরেক্টর বিরক্তিপ্রকাশ করিলেন, "আমার বিস্তর কাজকর্মের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে তিনদিন আমরা বসলাম। কোন কাজই এগুলো না।"

সঙ্গীত পরিচালক প্রমাদ দেখিয়া বলিলেন, "দুটো গল্প তো বাছা আছে। শান্তি সেনের আর অমল রায়ের। একটা ধরে শুটিং শুরু করা যাক। এইতো আমাদের শেষ ছবি নয়। এখনকার মত সেই দুটো গল্পের যে কোন একটা নিন না।"

সৌম্যেন সেন বলিলেন, "বাজে গল্প ধরে বই নষ্ট করার আমি পক্ষপাতী নই।"

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। সঙ্গীত পরিচালক তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "বদলে-টদলে নিলে শান্তি সেনের গল্পটা নেহাত খারাপ হ'বে না।"

ক্যামেরাম্যান বলিলেন, "একবার গল্প ছটো সকলে শুনে নিন না। আমার তো মনে হয় অমল রায়ের গল্পটায় বেশী সম্ভাবনা আছে।"

একজন ডিরেক্টর বলিলেন, "কেউ একজন পড়ে শোনান।" গল্প ছইটি বাহির হইল। দৈর্ঘ্য দেখিয়া সকলেই নিরুৎসাহ। রেস্তদার-ডিরেক্টর বলিলেন, "এত বড় গল্প পড়া চলবে না এখন। আটটায় আমার জরুরী মিটিং আছে। অন্যদিন হ'বে।"

অবশেষে তাহাই স্থির হইল। আগামী কাল সকলে আবার একত্রিত হইবেন। আগামী কালের মধ্যে সমস্ত ঠিক হইবে।

কেয়া সোম নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। নানারূপ অস্বস্তিকর অনুভূতির পীড়ন হইতে রক্ষা পাইতে চায় সে। এই বাড়ীতে সে আরও একদিন কয়েক মিনিটের জন্য আসিয়াছিল। সিনেমা-কম্পানির অফিস দেখিয়া গিয়াছিল। সেদিন তাহার আগমন এবং গমন ক্ষণকালীন —বিশেষ অনুভূতি চিহ্নিত নয়। কিন্তু, আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ীতে পদার্পণ মাত্রে সর্ব দেহমন শিহরিত হইয়া উঠে। কেয়া সোম সেদিন সকাল বেলা এখানে বাড়ী দেখিতে আসিয়াছিল। প্রভাতের নির্মল উজ্জ্বল আলোকে বন্ধ পেটিকার মত বাড়ীটি তাহার সর্ব রহস্য গুপ্ত রাখিয়াছিল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট কুহেলীর মধ্যে অশুভ আত্মা যেন মুক্তি পাইয়াছে। মুক্ত করিতে চাহিতেছে বেদেনীর সাপের ঝাঁপির মুখ। সর্পিল অতীত সর্পের মত বাহির হইয়া আসিতে চায়। কেয়া সোম এখান হইতে পালাইয়া বাঁচিতে চায়। সুতরাং, যাইবার সুযোগ পাওয়া মাত্র সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সঙ্গে সঙ্গে মেজের ফরাসের একপাশ হইতে উঠিল প্রতাপ শেঠ। মনোহর শেঠের কনিষ্ঠ পুত্র। ধনী পিতার অর্থের বিনিময়ে কম্পানির একজন ডিরেক্টর।

চুড়িদার সাদা পাঞ্জাবি, পকেটে পানের রূপার বাক্স। ঘরে কিশোরী বধূ। স্টুডিবেকার গাড়ী নিজে চালাইয়া এবং সেতার শিখিয়া শেঠজীর পুত্র সংস্কৃতির ও আধুনিকত্বের পরিচয় দিতে উদ্‌গ্রীব।

"মিস সোম, চলুন আপনাকে পৌঁছে দি।" প্রতাপ ব্যগ্র আগ্রহে বাহির হইল।

সৌম্যেন সেনের সিগারেট-ধরা অধরের পাশে একবিন্দু ফিকে হাসি দেখা দিল। পেলব-তনুদেহা কেয়া সোম। ইন্‌টেলেকচুয়াল নারী বলিতে যে মারাত্মক জীবের কথা মনে আসে, কেয়া সোম সেই পর্যায়ে পড়ে না। তাহাদের রুক্ষ কর্কশ বহিরাবরণ, স্বল্প-গুরু ভাষণ, হাস্যহীন অধর, পুরুষালী ধরন। বিদেশেও মহিলারা সহজে ইন্‌টেলেকটুয়ালিস্‌ম্ হজম করিতে পারেন নাই। লেখিকা-শ্রেণীর নারীরা তাই শিঙ্গল চুল এবং টেলার্ড-পোশাকের ভক্ত। কিন্তু শ্যামা বাংলার মেয়ে কমনীয়তায় অনবদ্যা রহিয়া গিয়াছে। আকাশের দিকে চোখ মেলিয়া সৌম্যেন সেন ভাবিলেন, কেয়া সোম সিনেমা কম্পানির মূলধন। আহা, যদি কেয়া ছবিতে নামিতে রাজী হইত!

প্রতাপের পাশে পাশে আচ্ছন্ন ভাবে কেয়া সোম সিঁড়ি দিয়া নামিল। মন্ত্রমুগ্ধার মত কেয়া সোম চাতাল পার হইল। মনে হইল যেন তীব্র গন্ধকের গন্ধে বায়ুস্তর ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। যেন একখানা ক্লোরোফর্মযুক্ত রুমাল এই সিঁড়ির নীচে কেহ তাহার নাকে-মুখে চাপিয়া ধরিল। যেন সেই মাদক গন্ধে মাথা এখনও ঝিমঝিম করিতেছে। মূর্ছার সর্বগ্রাসী গহ্বর হইতে অতিকষ্টে নিজের সত্তাকে বিমুক্ত করিয়া প্রতাপ শেঠের গাড়ীতে উঠিল কেয়া সোম।

গলি পার হইয়া বিদ্যুৎবেগে বড় রাস্তায় গাড়ী চলিয়া আসিল। স্টিয়ারিং ধরিয়া কেয়া সোমের বিবর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিল প্রতাপ, "মাথা ধরেছে কি? একটু গঙ্গার ধারে চলি?" "না না, আমি বাড়ী যাব। মায়ের জ্বর হয়েছে ক'দিন।" কেয়া সোমের নিষেধে প্রতাপ নিশ্বাস ফেলিয়া দক্ষিণমুখে গাড়ী চালাইল।

কেয়া সোম বলিল, "কাল আবার আসবার দিন ওঁরা ফেললেন। রোজ রোজ এইভাবে সময় নষ্ট করা আমার পোষায় না। কাল আমি আসব না। যা হয় স্থির করবেন আপনারা।"

প্রতাপ অস্থির হইয়া উঠিল, "না, না। তাকি হয়? আপনি না গেলে চলবে না। সৌম্যেন বাবু একটু যা আপনার কথাই শোনেন। ওঁরা নিজেরা কিছুই ঠিক করে উঠতে পারবেন না। আরও সময় নষ্ট হ'বে।"

কেয়া সোম ইতস্ততঃ করিল, "এতদূর থেকে যাতায়াত বড়ই অসুবিধা। বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ।"

"আমি কাল আপনাকে নিয়ে যাব।"

"আপনি অতদূর থেকে আসবেন না।"

"আপনার জন্যে আরও দূর থেকে আসব।"

কেয়া সোম চকিত দৃষ্টিতে চাহিল। মুখের ভাষা অতি ভদ্র হইলেও চোখের দৃষ্টি লুব্ধ প্রতাপের। কেয়া সোমের গ্রীবা-লুণ্ঠিত কাল কবরী হইতে পায়ের লাল রং করা অঙ্গুলি পর্যন্ত সেই লোভের বিচরণ। কিন্তু ললাটে সৌম্য-উদারতা, মুখে প্রসন্ন শালীনতা প্রতাপ শেঠের। তাহাকে ছোঁয়া কঠিন।

কেয়া সোমের দৃষ্টির আলোকপাতে বোধ হয় প্রতাপ নিজেকে পড়িতে পারিল। চোখ রাস্তার দিকে ফিরাইয়া কেয়া সোমের বাড়ীর রাস্তায় সে গাড়ী ভিড়াইল।

কেয়া সোমের বাড়ীর চমৎকার বহিৰ্চ্ছদ, কিন্তু মধ্যে তিনখানি ঘর মাত্র তাহারা রাখে। একতলার ফ্ল্যাটের প্রবেশ, পাশের গলিপথ।

গাড়ী থামাইয়া প্রতাপ লাফাইয়া নামিল। দরজা খুলিয়া ধরিল। অবাঙালী সুলভ হইলেও বংশমর্যাদায় তাহার ভদ্রতা বিশিষ্ট। অনুনয়ের স্বরে বলিল, "কাল তাহ'লে পাঁচটায় আসছি।"

কেয়া সোম তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারিল না। ওই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছা তাহার, কিন্তু দূরে সে তো সরিয়া থাকিতে

পারে না। নিগূঢ় কঠিন কোন আকর্ষণ তাহাকে প্রাচীন বাড়ীটির সহিত বাঁধিয়াছে। কেয়া সোম ফিরিয়া যাইতে চায়। বার বার সে ফিরিতে চায়।

ফিরিতে তাহাকে হইবে, তাহার একটি কর্মক্ষেত্রে ওই বাড়ী। অযথা মানসিক বিলাসকে প্রশ্রয় দিয়া লাভ কি? স্নায়ুদৌর্বল্য ঘটিয়াছে তাহার। এমন বিচিত্র চিন্তা বা আতঙ্ক কেন? কোন কারণই নাই। অবচেতনের দুর্ব্যবহারে কেয়া সোম অস্থির হইয়া উঠিল।

"তাহ'লে কাল পাঁচটায় দেখা হচ্ছে?"

"আ—চ—ছা।" ধীরে, অনিচ্ছায় উত্তর দিল কেয়া সোম।

প্রতাপ চলিয়া গেল। কেয়া সোম গলির পথ ধরিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিল।

কেয়া সোমের বৃদ্ধ পিতা খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। শীর্ণ মুখে বিরক্তির ছাপ শেয়ার মার্কেটের দর দেখিয়া। মা ম্যালেরিয়া জ্বরে ভোগেন মাঝে মাঝে। আজও তাই কাঁথা মুড়ি দিয়া শয্যাগত। ছোট বোন বি. এ. পরীক্ষার পড়া পড়িতেছে।

"দাদা ফেরেনি?" কেয়া সোম বাহিরের জুতা ছাড়িয়া পাতলা চটী পরিল।

চম্পা সোম বলিল, "না।"

মা খাটের উপর হইতে আক্ষেপ করিলেন, "বাড়ীকে বাড়ী মনে না হলে ফিরতে ইচ্ছা হয় না।"

কেয়া জামা কাপড় পরিবর্তন করিয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। দাদার বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে। দাদার বিবাহ দেওয়া উচিত। মায়ের পুত্রবধূ দেখিবার সাধ প্রবল। কিন্তু, আয় পরিবর্ধিত না হইলে নূতনকে কি করিয়া আহ্বান করা চলে?

দাদার আয়ে সংসার চলে অতিকষ্টে। বৃদ্ধ পিতার ব্যয় তিনি

নিজে নির্বাহ করেন। এখনও শেয়ার-মার্কেটে বড়লোক হইবার স্বপ্ন তাঁহার শেষ হয় নাই। একদিন তাহাদের টাকা ছিল। কেয়ার মনে পড়ে। এখনও কেয়ার কানে রৌপ্যমুদ্রার ঝঙ্কার ভাসিয়া আসে।

সকালে উঠিয়া কার্পেটের উপর পা পড়িত। দাসী চায়ের কাপ পৌঁছিয়া দিতে ঘরে। বিকালবেলায় গাড়ীতে হাওয়া খাইতেন মাতা-পিতা পুত্র-কন্যাকে লইয়া। তারপর একদিন শেয়ার মার্কেটে সর্বস্ব গেল।

ষোড়শী কেয়া সোমের মণিপ্রভ অঙ্গুলিতে হীরকখচিত বিবাহ-স্মারকাঙ্গুরীয়ের পরিবর্তে কলম উঠিল। কেয়ার নিজের খরচ নিজেকে চালাইতে হইত।

চম্পা দিদির ঘরে আসিল, "খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে নেওয়া যাক, দিদি। আবার তো পড়তে বসতে হ'বে। দাদার খাবার ঢাকা দিয়ে রাখি।"

দুই বোন খাবার ঘরে চলিয়া গেল। পিতা সন্ধ্যাবেলায় চারখানি লুচি চিনিসহ জলযোগ করিয়া থাকেন। রাত্রে এক কাপ দুধ খান। সম্পদের সময়ে লুচির পাশে ঘরে তৈরি সন্দেশ থাকিত।

পালিস-ওঠা কাঠের টেবলে রুটি-তরকারি .মাছ ভাজা লইয়া দুই বোন বসিল। রান্নার লোকটি গৃহিণীর বার্লি জ্বাল দিতে গেল।

চম্পা বলিল, "দেখ, মাছগুলো পুড়িয়ে কাঠ করে ফেলেছে ফ্যালা। তুমি বাইরে-টাইরে খেয়ে এস। আমাদের আর রোজ এই ঘ্যাঁট মুখে রোচে না।"

ফ্যালা উদ্বাস্তু সন্তান। অল্প মাহিনায় ফ্যালার চেয়ে ভাল রান্না আমদানী হয় না বলিতে গেল কেয়া সোম। কিন্তু, তাহার কথা বলা হইল না।

বিগত সম্পদের দিনে পরিষ্কার টেবিল-ক্লথের উপর সজ্জিত ভোজ্য-পাত্র মনে পড়িতেছিল কেয়ার। চম্পা ছোট ছিল। বিগত ঐশ্বর্যের দহন তাহার চিত্তে এত আক্ষেপ আনে না।

আধুনিক ধনীগৃহের পরিবেশ মিলিয়া গেল। হঠাৎ ঠাণ্ডা সাপের গায়ের মত একটা শীতল অনুভূতি কেয়া সোমকে বেড়িয়া ধরিল। সাদা-ঠাণ্ডা মার্বেলের মেজে আধো অন্ধকারে দেখা দিল। পুরু গালিচার আসন পাতা। রূপার থালায় নানাবিধ ভোজ্য। একজন কে বসিয়া আছে? লাল টুকটুকে শাড়ী—তুই পেড়ে নিতম্বের উপর দিয়া চ্যাটাই-বোনা পাড় চলিয়া গিয়াছে। মুখের ঘোমটা কলাবৌ এর মত সূচ্যগ্র। তাহার সেই ঘোমটার মধ্যে হাত দিয়া কে একজন আধাবয়সী মহিলা তাহাকে খাওয়াইয়া দিতেছেন। তাঁর পরিধানে ঢাকাই ফিন্‌ফিনে শাড়ী। গলায় চওড়া সোনার পাটি-চিক্‌, হাতে যশম। তাঁর কানে চৌদান দোলে।

চম্পা দিদির দিকে তাকাইল নৈঃশব্দ দেখিয়া। কেয়ার হাত থালার বুকে অনড়। চোখে শূন্য দৃষ্টি। দিদি ভাবুক, চম্পা বিলক্ষণ জানে। দিদির ভাবুকতার মূল্য তাহারা দিতে শিখিয়াছ, কারণ বাহিরের জগতে দিদির ভাবুকতার মূল্য আছে।

চৌদানের নীচে পান্নামুক্তার দোলকের তুলুনী বন্ধ হইবার পূর্বেই কড়া বিজলি আলোয় স্তিমিত মার্বেলকক্ষ মিলাইয়া গেল। বিংশ শতাব্দীর বুকে কেয়া সোম ফিরিয়া আসিল।

চম্পা রুটির উপর একচামচ জেলী ঢালিয়া খাইতে খাইতে প্রশ্ন করিল, "আজ কে তোমাদের বাড়ী ছেড়ে গেলেন, বলতো? ভারী সুন্দর দেখতে কিন্তু ভদ্রলোক।"

"ওঁর নাম প্রতাপ শেঠ। 'কামনা' ফিল্ম কম্পানির একজন ডিরেক্টর।"

চম্পা আরে কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। আহার শেষ করিয়া বই হাতে বসিল। কেয়া মাতার বার্লি, পিতার দুধ জাপানী ট্রে করিয়া বহিয়া নিল। তারপর নিজের ছোট ঘরখানি আশ্রয় করিয়া লিখিতে বসিল। এই সপ্তাহে তাহার বেতার ভাষণ আছে।

কলম আজ দ্রুত চলে না। কেয়ার মনে বার বার বাড়ী-

খানির স্মৃতি ফিরিয়া আসে। গহন গভীর কোন রহস্য তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। তাহারি সত্তার কোন অংশ যেন ওই ভিত্তিতলে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে।

কেয়ার দাদা কেশর সোম নৈশ ভ্রমণান্তে বাড়ী ফিরিল। সংসারের আর্থিক ক্ষতি সর্বাপেক্ষা আঘাত দিয়াছে তাহাকে। এম-এ পাশ করিয়া কেয়ার অক্স্‌ফোর্ডে যাইবে স্থির ছিল। আকস্মিক অর্থনাশ তাহাকে একটি সাধারণ চাকরিতে যুক্ত করিল। সুন্দর মুখে তাই তাহার চির অসন্তোষ।

দাদার খাবার ঢাকা ছিল। অন্যদিন আহারাদির পরে কেশর কেয়ার ঘরে বসিয়া একটি-দুইটি সিগারেটের সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া যায়। বোনের হাতে আজ কলম দেখিয়া সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কেয়া কলিকাতা-সমাজে নাম করিয়াছে লেখিকা হিসাবে। কেয়াকে বিরক্ত করা চলিবে না। নইলে সুমিত্রার কথা একটু আলোচনার ইচ্ছা ছিল কেশরের।

দাদা শুইতে গেল। দাদার মানসচক্ষে সুমিত্রার রূপ হয়তো ফুটিয়া উঠিবে। সৌমিত্রি চন্দের ছোট বোন সুমিত্রা। কেশব সেনকে হয়তো হৃদয় দান করিয়াছে, কিন্তু বাগদান করিবে কিনা বোঝা যায় না।

ঘড়িতে সাড়ে এগারো রাত্রি। কেয়ার চোখে ঘুম, কেয়ার মনে শ্রান্তি।

সাদা বিছানার আহ্বান উপেক্ষনীয় নয়। কেয়া কলম রাখিল, কাগজ গুছাইয়া তুলিল। কেমন একটি আলোড়নকারী অনুভূতি তাহার চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অপরাহ্ণের পর হইতে সেই বাড়ীখানির চিত্র কেয়াকে অনেক কথা বলিয়া দিতে চায়। এত লোকের মধ্যে সে যেন কেয়া সোমকে চিনিয়া লইয়াছে। এত লোকের মধ্যে একমাত্র কেয়ার সঙ্গেই যেন তার কথা আছে।

বিছানায় কেয়া মনকে অন্যদিকে দিতে চেষ্টা করিল। প্রতাপ

শেঠ মন্দ লোক কি? চম্পা তাহাকে পরম রূপবান দেখিয়াছে। কিন্তু, প্রতাপকে ভাল লাগে না কেয়ার। ঘোর ব্যবসায়ী—লোভী একটি আত্মা প্রতাপের মধ্যে কেয়া দেখিতে পায়। রূপবান প্রতাপ কেয়ার চোখে কুৎসিত।

বিবাহিত প্রতাপ শেঠ। তাই কি তাহার মনোযোগে কেয়া বিব্রত বোধ করে? তাই কি অস্বস্তি?—না, বন্ধুভাবে প্রতাপকে সে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিত। সুদর্শন-মার্জিত ধনীপুত্র কেয়াকে বন্ধুভাবে অনেক সাহায্য করিত। কিন্তু প্রতাপকে দেখা মাত্র কেয়ার জাগে অশান্তি। প্রতাপকে নিকটে আসিতে দিলে যেন কেয়ার কোন বিপদ ঘটিবে। বেপরোয়া ধনীপুত্রকে আমল দিলে পরে মধ্যবিত্ত কন্যার অসুবিধা সকলেই জানে। কিন্তু, কেয়া সোম শিশু নয়। সে ভয় পায় কেন?

ভয়? ঠিক। হাড়-জল-করা শিরশিরে একটা অনুভূতি কেয়া সোমের পা হইতে মাথার দিকে উঠিয়া আসিল। পাশ বালিশ জড়াইয়া বিছানার বুকে নিজের ক্লান্ত শরীরকে মিলাইয়া চোখ বন্ধ করিল কেয়া।

কেয়া সোমের স্বপ্ন

এলোমেলো ছোট ছোট গলি। মাঝে দুই একটা কাঁচা রাস্তাও আছে। মিটমিটে গ্যাসের আলো জ্বলছে। একখানা ঢাকা পালকি চলছে। সঙ্গে ছয়জন বেয়ারা। ছাতা ঘাড়ে কতকজন ছাতাবরদার সঙ্গে। পালকির পিছনে তঞ্জাম, মানুষ বয়ে নিয়ে চলছে। পালকির আগে জ্বলন্ত মশাল হাতে মশালটি পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। তঞ্জামখানা রুপোয় মোড়া। চকচক করছে।

ঘড়ঘড় করে ট্রামওয়ে কম্পানির অস্ট্রেলিয়ার ওয়েলার ঘোড়া যোতা ট্রাম চলে গেল। শেঠ বাড়ীর বড়কর্তার জুড়ি পাশ

কাটিয়ে চিৎপুরের পথ ধরলো। সহিসরা মোড়ের মাথায় চামর দুলিয়ে লোক সাবধান করবার জন্য চীৎকার করছে।

গড়ের মাঠে সারি সারি গাড়ী চলছে সন্ধ্যার পরে, ব্রুহাম, ব্যারূষ, ব্রাউনবেরি। চৌঘুড়ি একখানাও চার ঘোড়ায়—যোতা চলেছে। চারটি ঘোড়ার রাশ টেনে দাঁড়িয়ে আছে কোচম্যান। খোলা গাড়ী আলো করে বসে আছেন পাথুরেঘাটার রাজার দৌহিত্র।

রাত্রি আটটায় কেল্লা থেকে তোপ পড়ে গেছে। পথঘাট নির্জন। লালবাগ বা পার্ক নির্জন, লালদীঘির মাছগুলো সাঁতার ভুলে গেছে।

আমি চলেছি পালকি আর তঞ্জামের পিছনে কি একটা মোহে। আমি কে তাও বলতে পারি না। শুধু জানি নির্জন রাস্তায় সেই রুপোমোড়া তঞ্জাম আমাকে কোথাও টেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন কলকাতার পথে পথে ফিরছি আমি। আমি কে?

চিৎপুরের রাস্তা এল। শেঠ বাড়ীর কর্তার জুড়ি ঘেরা পালকি ও তঞ্জামের আগে চলছে দেখা যায়। চিত্তেশ্বরী দেবীর এক বিরাট মন্দির আছে চিৎপুরের পূর্ব দিকে। 'ডাকাতে কালী' মন্দিরে শেঠবাবু রাত্রে এলেন কেন? এখানে নরবলি হ'ত। এখানে সেদিন পর্যন্ত সতাদাহ হয়েছে। শেঠবাবু একা একা ডাকাতের আড্ডায় কেন?

তঞ্জামের মধ্যে বসে আছে কে? নূতন বর, না? হীরের তাজ, হীরের কণ্ঠি, মুক্তার মালা। বুকে জরীর কাবা, পায়ে দিল্লীদার জরীর লপেটা। ঢাকা পালকি পেছনে আসছে। কে আছে দেখা যায় না।

চিৎপুর ঘুমিয়ে আছে—দূরে গঙ্গার স্রোত ছলছল করে বয়ে চলেছে। কোথা থেকে প্রাচীন কলকাতার গান ভেসে আসছে।

"বাগবাজারে এসে ঠাকুর রহিলেন বোসে,
বিষ্ণুপুরের শ্রীমন্দিরে পাথর পড়ে খসে'।
রাজা কাঁদেন, রাণী কাঁদেন, কাঁদেন প্রজাগণ,
পূজারী ব্রাহ্মণ কাঁদেন হয়ে অচেতন।
হাতিশালের হাতি কাঁদে, ঘোড়ায় না খায় পানি,
বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন গোপাল সিংহের রাণী।"

বাগবাজারে গঙ্গার ধারে মদনমোহন ভুলে আছেন বিষ্ণুপুর। শ্রীরাধিকা সখিসহ তাঁর পাশে। মঞ্চের নীচে ভক্তিবিহ্বল জনতা। শঙ্খঘণ্টার শব্দে ঠাকুরবাড়ী কাঁপছে। কিন্তু বিগ্রহের সঙ্গে চীৎপুরের সম্বন্ধ কি?

হঠাৎ কাঁহুনে মদনমোহনের ছড়া মিলিয়ে গেল বাগবাজারের গঙ্গার ধারে। ভেসে এল চিত্তেশ্বরী দেবীর প্রাচীন মন্দির—চিৎপুরের অধিষ্ঠাত্রী, দস্যু দলপতি চিত্তের প্রতিষ্ঠিতা দেবী—ডাকাতে কালী।

ধুনির আগুন জ্বলছে, চিৎপুর রাঙা হয়ে উঠেছে। আশেপাশে জঙ্গল। ছায়ার মত মূর্তি কতকগুলি। তাদের মুখে নবাব সিরাজদ্দৌলার সৈন্যদের গান :—

"নবাব বাহাদুরকা ফৌজ,
যৈসি খোলা তলোয়ার,
ঘড়ি ভরমে জিৎলিয়া
কেল্লা কলকাতা বাজার।"

গানের লয় দ্রুত হতে লাগল। ছায়ামূর্তিগুলোর পা পড়তে লাগল ঘন ঘন। গভীর রাত্রে একি বীভৎস নাচগান।

কানের পর্দা ফাটিয়ে একটা কর্কশ চীৎকার এল : "হারে রে রে, হারে রে রে।"

চমকে চেয়ে দেখলাম শেঠ কর্তার হাতে একখানা খোলা তরোয়াল। তাঁরি মুখে অমনি ধ্বনি। একি, শেঠবাবু কি ডাকাতদলের কেউ নাকি? ওর অত টাকাকড়ি কি ডাকাতির টাকা।

সেই কর্কশ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল ছায়ামূর্তিদের কণ্ঠে কণ্ঠে। মশাল জ্বলে উঠল, হাতে হাতে লাঠি-শড়কি চমক দিল।

'হারে রে রে' ডাক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা তঞ্জাম ও পালকির উপর। ছাতা বরদার, বেহারা, মশালচি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তঞ্জাম থেকে নূতন বরকে টেনে নামাল। দুইধারে ধরে রাখল তাকে ডাকাতেরা। তারপর পালকির সাটিনের পরদা ছিঁড়ে, পাল্লা খুলে বার করল এক নববধূকে। সিঁথিপাটি, ঝাপটা ঢাকা কচি মুখ, গজমতির নোলক নাকে। একজন ডাকাত মশাল তুলে ধরল। কার মুখ? হে ঈশ্বর, কার মুখ দেখালে? এ যে আমি।

প্রাচীন কলকাতায় ষোড়শী বধূ আমি কেয়া সোম কি করে হলাম?

শেঠবাবু আর এখন শেঠবাবু নয়—তরোয়াল ঘুরোতে ঘুরোতে পালকির ধারে এলেন। নববধূর মুক্তার সরস্বতী হার ছিড়ে মুক্তা গড়াগড়ি যাচ্ছে। ডাকাতেরা হরিলুটের বাতাসার মত হুড়োহুড়ি করে কুড়োচ্ছে।

"খবরদার!" শেঠজী হাঁক ছাড়লেন, লাল মুখ তাঁর, চোখ অন্ধকারে বাঘের মত জ্বলছে। ডাকাতেরা মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

"ওকে তুলে দাও। আর পুরুষটাকে মায়ের পায়ের কাছে ফেল। আঃ, অনেকদিন মা রক্ত পাননি!"

আমি কেঁদে উঠলাম। কে কাকে নরবলি দিচ্ছে তাতে আমার চোখে জল কেন?

টুকটুকে লাল জড়ির ছড়কাটা জংলা বেনারসী মোড়া একটি বধূকে জোর করে টেনে নিয়ে গেল গঙ্গার ধারে। সেখানে মৌরপঙ্খী নৌকা ভাসছে। পাটাতনের ওপর একজন লালমুখ।

সাহেব বাঙালী বেশ পরে বসে আছেন চেয়ারে। সেকালে অনেক ইংরাজ দেশী লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করবার উদ্দেশে এমন পোশাক পরতেন বলে বইতে পড়েছিলাম। মসলিনের কামিজ, ঢিলে পায়জামা সাদা টুপী পরা সাহেবের হাতে আলবোলার নল। সাহেব তামাক

টানছেন, পেছনে হুঁকা বরদার তামাকের সরঞ্জাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড তালপাতার পাখা হাতে পাখাওয়ালা। মাথায় তার পাগড়ি, কোমরে সবুজ পেটি, সাদা মসলিনের জামা। ছবির মত দেখা যাচ্ছে বাতির আলোয়। সাহেবের পায়ের কাছে একখানা বাঘের চামড়া। মৌরপঙ্খীর পিছনের দিকে রান্নার নৌকা। একজন আবদার সোডার স্তূপের মধ্যে জলপাত্র বসিয়ে জল ঠাণ্ডা করছে। মদের পাত্রও ঠাণ্ডা করা হচ্ছে।

দাঁড়নৌকায় রান্না হচ্ছে, রাত্রির খানা। রসুইয়ে যত্ন করে সাহেবের স্টু তৈরি করছে। মাছ-মাংস দিয়ে রুপোর বাসনে রান্না করতে হয়। এই স্টুকে 'বর্ধমান স্টু' বলে। ভোগে ভোজ্যে টলমল করছে গঙ্গার বুক।

নববধূকে জোর করে মৌরপঙ্খীতে টেনে তুলল শেঠবাবুর লোকেরা। সাহেব কার্পেটের ওপর আলবোলার নল ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। ডাকাতদের সঙ্গে সাহেবেরও যোগ আছে দেখছি। দুইপাশ দিয়ে সোটাবরদার আশাশোটা হাতে দাঁড়িয়ে। মৌরপঙ্খী দুলে উঠল দূরের যাত্রার বাতাসে। ওদিকে চিত্তেশ্বরীর মন্দির হয়তো এতক্ষণে নরবলির রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।

কোথায় যাচ্ছ গো? মন-পবনের মৌরপঙ্খী নাও? বিদেশী হরণ করে নিয়েছে বাঙলার বধূকে? চন্দননগর যাচ্ছ, না সুখসাগর?

না গো না। যাত্রা মৌরপঙ্খীর অনেক দূরে—চীনে যাচ্ছি আমরা। চীন? অতদূরে! চীনে কেন?

না, আমি চীনে যাব না। যাব না, যাব না। না! না! না!

"কি হয়েছে দিদি? ভোর রাত্রে না-না বলে চেঁচাচ্ছ কেন? ওঠো, ফ্যালা চায়ের জল বসিয়েছে।"

কেয়া সোম চোখ খুলিল। তখনও মন দুঃস্বপ্নে কবলিত। দেহ ঘর্মাক্ত, কণ্ঠ শুষ্ক। সদ্য ঘুমভাঙা মুখের উপর অবনত একখানি

কমনীয় লাবণ্যময় মুখ—একটু আগেই এই মুখ কেয়া স্বপ্নে দেখিয়াছে।

মেটে লাল বেনারসীর জড়ি গ্রীবার পাশে জ্বলিতেছে। কনে-চন্দনলেপা ত্রিকোণ ললাট, সাদা মোমবাতির মত কানে সোনার কান, নাকে গজমতির নোলক। একটু আগেই মশালের আলোয় সাহেবের মৌরপঙ্খীর বুকে এই মুখখানাই নাকি দেখিয়াছিল কেয়া সোম?

প্রাচীন বিগত শতাব্দীর কলিকাতার পথে পালকির মধ্যে এমনি একখানা মুখ দেখা গিয়াছিল সাটিনের পরদার পাশে।

আরও কাছে গালিচার আসনে বসা, লাল শাড়ী পরা, ঘোমটায় মুখ ঢাকা, মেয়েটিরও মুখ এই মুখখানিতে লেখা আছে। আবার এই মুখে মিলিয়া গেল, মিশিয়া গেল কেয়ার নিজের মুখটি!

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কেয়া সোম উঠিয়া বসিল চম্পকগৌরী চম্পার আহ্বানে, চম্পার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া। এলোমেলো চুলে ঘেরা চম্পার মুখ আর স্বপ্নের মুখ নয়।

"খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলে বুঝি? ভাগ্যি, রাত্রে দোরে খিল দাওনি, তাই ঠেলে তুলে দিতে পারলাম। কি স্বপ্ন দেখে 'না না' করছিলে? চোরের স্বপ্ন বুঝি?"

কেয়া পায়ে চটি টানিয়া তোয়ালে হাতে স্নানাগারের দিকে চলিল। এতবড় আন্তর্জাতিক চৌর্য স্বপ্নে দেখিয়াছে কেয়া, যাহা বর্ণনা করা চলে না। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নও সরিয়া যাইতেছে।

সারাদিন কাজের মধ্যে কাটিয়া গেল। বেতার ভাষণের লেখাটা শেষ করিল কেয়া। বেলা নয়টায় একটা কাজে বাহিরে গেল কেয়া। যথাকালে আহারাদি শেষ করিল। মা-বাবার সেবায় মনোযোগী হইল। গৃহস্থালির সামান্য তদারক করিল। এখন পাঁচটার ও বেলা দুইটার মধ্যে বাড়তি সময়টুকু কেয়ার হাতে।

দুইচারখানা গানের বায়না আছে, লিখিতে বসা চলিত। কিন্তু

সকাল হইতে কেয়ার মন অতিশয় বিষণ্ণ, কেমন একটা গ্লানির ভারে অবসন্ন। স্বপ্নের স্মৃতি তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে বিমনা করিতেছে। স্বপ্ন সম্পূর্ণ মনে নাই। বহু লোকের মতই নিশীথ-স্বপ্ন কেয়া সোম ভুলিতে চায়। কিন্তু, এত স্পষ্ট বস্তু ভোলা কঠিন। বীভৎস রূপ তার কেয়াকে ভয় দেখায়। মনের এমন অবস্থায় গান আসে না।

দিবানিদ্রার অবকাশ প্রত্যহ থাকে না। আজ, না হয় একটু দরজা জানালা বন্ধ করিয়া 'বিউটি স্লীপ'এর যোগাড় দেখা যাক। কিন্তু নিদ্রার নামে কেয়া আবার ভীত হইল। যদি ঘুমের ঘোরে ভয়াবহ স্বপ্নটির ভগ্নাংশও ফিরিয়া আসে!

একখানা বই হাতে বসিল কেয়া। জ্ঞানার্জনের সময় তাহার হাতে কমই থাকে। আজ অনায়াসে সময়টুকু সে পড়াশোনায় ব্যয় করিতে পারে।

ঘড়ির কাঁটার গতি অবাধ। কেয়া সোমের মনে অহেতুক উত্তেজনা। অপরাহ্ণ পাঁচটা প্রায় আবির্ভূত। কেয়া কেন এত অনিচ্ছুক?

সেই বাড়ী! কেয়া যাইতে চায়না সেখানে। কেন তাহার মনে অস্বস্তিদায়ক অনুভূতি কেয়া বোঝে না। প্রতাপ শেঠ তাহাকে লইতে আসিবে। প্রতাপের সঙ্গে কেয়া কোথাও যাইতে চায় না।

সেই বাড়ী! স্তরে স্তরে তাহার অকথিত বাণী। সে কথা বলিতে চায়। কেয়াকে তো যাইতেই হইবে। কেয়ার কোন গূঢ় সত্তা বাড়ীর ভিত্তিমূলে প্রোথিত আছে। সেই সত্তার আত্মা কেয়াকে ডাকে—কেয়া চল, চল।

বই ফেলিয়া প্রসাধনে মন দিল কেয়া। বৈকালিক চায়ের ভার চম্পার হাতে। চায়ের কাপ আর ফ্যালার অবদান আধসিদ্ধ ঘুগ্‌নি দিদির ঘরে দিতে আসিল চম্পা।

"বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে! এমন মনোহারিণী বেশে যাচ্ছ কোথায়?" চায়ের কাপে চুমুক দিয়া কেয়া বলিল, "কামনা ফিল্ম কম্পানির আজ গল্প বাছা হবে।"

"ও, সেই সুন্দর ভদ্রলোক যেখানকার ডিরেক্টর!"

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় হর্ণ শোনা গেল। কেয়া চকিত হইয়া বলিল, "উনি এসেছেন আমাকে নিতে। লক্ষ্মীটি, ওকে একটু দাদার ঘরে বসাও। আমি আসছি।"

কেশরের ঘরের মুখ বাহিরের দিকে। সেখানে অভ্যাগতকে বসানো হয়। ঘরটি একটু বিশেষভাবে সেই উদ্দেশে সাজানো আছে।

চম্পা দীর্ঘ বেণী দুলাইয়া সানন্দে চলিয়া গেল। রাস্তায় গাড়ীতে প্রতাপ শেঠ অপেক্ষমান।

"একটু বসবেন ঘরে, আসুন। দিদি আসছেন।"

প্রতাপ বিস্মিত হইল। এমন চম্পকবরণী দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী বাঙালী ঘরে দুর্লভ। কেয়া সোমের সৌন্দর্য কমনীয়তায়, চম্পা সোমের সৌন্দর্য সবলতায়। সজোরে মনে আঘাত করে তাহার দীপ্তি, চোখকে ঝলসিত করে। কেয়ার এমন সুন্দরী বোন আছে?

প্রতাপের মুগ্ধদৃষ্টিবিহ্বলা চম্পা ঘরে তাহাকে বসাইল। ভদ্রতাসূচক যৎসামান্য কথার বিনিময় উভয়পক্ষে দেখা গেল। পরস্পর পরস্পরের রূপমুগ্ধ—এমন তরুণ-তরুণীর বিশেষ কথাবার্তার প্রয়োজন হয় না।

রক্তাম্বরা আজ কেয়া। লাল রং কেয়ার প্রিয় রং নয়। হাল্কা স্বপ্নালু নীল, ক্ষীণ হরিৎ, বিলীয়মান বাসন্তী বর্ণ সে ভালবাসে। আজ প্রখর রং তাহাকে টানিয়াছে।

কাউচ হইতে প্রতাপ মুহূর্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্তে সমগ্র মন তাহার চম্পকবরণী হইতে কমলদলবাসিনীর দিকে চলিয়া গেল। কেয়াকে রথে তুলিয়া উড়িয়া যাওয়া ভিন্ন তাহার জীবনে অন্য লক্ষ্য নাই।

মলিনা চম্পা দরজার পর্দা ধরিয়া দেখিতে লাগিল। গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব মুহূর্তে প্রতাপের দৃষ্টি পড়িল। না, ইহাকেও

তো প্রতাপ অবজ্ঞা করিতে পারে না। ইহাকেও তো প্রতাপের দেয় সামগ্রী আছে। মদির দৃষ্টি ও মধুর হাসি দিয়া প্রতাপ চম্পাকে আরতি করিল—"আবার দেখা হবে।"

আবার দেখা হইবে সকলের সঙ্গে সকলের। কেয়ার চোখে লাল রংএর বন্যা—স্বপ্নের লাল বেনারসী। কেয়ার লাল শিফন বাতাসে পালের মত ফুলিয়া উঠিল। নীল আকাশ আচ্ছন্ন করিল আঁচলের রং। সারা পৃথিবীতে লাল রংএর বন্যা।

কেয়া সোম, তুমি চল, তুমি চল।

মন-পবনের মৌরপঙ্খী নৌকার গতি অপেক্ষা প্রতাপ শেঠের স্টুডিবেকার গাড়ীর গতি দ্রুততর। অতএব গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইতে সময়ক্ষেপ হইল না।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া রহস্যময় অট্টালিকার কোণে কোনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। দোতলা পার হইয়া, তেতলার পাশ কাটাইয়া চারতলায় উঠিতে লাগিল কেয়া সোম। সঙ্গে সঙ্গে আবার ভাষাহীন অতীত ছবির মত কেয়ার চোখে ভাসিয়া উঠিল। সমগ্র জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া ডায়েরীর ছিন্ন পাতা উড়িতে লাগিল। কোন ব্যথিত সত্তা কেয়ার কানে কথা বলিয়া গেল।

ডায়েরীর পাতা

"এ-বাড়ীতে সন্ধ্যা হ'তে হ'তে বৈঠকখানায় গ্যাসের ঝাড় জ্বলে, বগী-জুড়ী গাড়িতে রাস্তার সরু পথটুকু ভরে ওঠে। ফিটন থেকে রেশমী রুমাল হাতে নিমকের দেওয়ান বাবুর দৌহিত্র নামলেন। তেতলার ঝুল বারান্দার চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতাম আমি। তরু-ঝিয়ের মুখে অনেক বাবুর পরিচয় পেতাম। বগী নিজের হাতে হাঁকিয়ে মিত্তির বাবু এলেন, পাশে তাঁর বন্ধু। ব্রুহাম থেকে

নামলেন হৃদয়প্রসাদ বাবু, আলবার্ট ফ্যাশানে চুল ফেরানো, ছড়ি হাতে।

নামলেন জুড়ী থেকে ট্যাসেলওয়ালা টুপী, চাপকান পরা পলাশডাঙ্গার জমিদারবাবু, সঙ্গে এক ডজন মোসাহেব। লোকে লোকারণ্য। শ্বশুরমশায় সিমলের ফিন্‌ফিনে ধুতি, ঢাকাই চাদরে সাজ করে তাঁর মোসাহেবদের মধ্যে দিয়ে, বা'র হ'লেন। গলায় সোনার হার, হাতে ইষ্টকবচ। পান, আতর, বেলফুলের মালা রুপোর রেকাবে সাজিয়ে খানসামা নিয়ে যাচ্ছে।

কোন কোন দিন খেমটা নাচের ঘুঙুরের শব্দে মন চমকে ওঠে। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে নাচের আসরের ছিটেফোঁটা চোখে পড়ে। জড়ির মছলন্দে ভেলভেটের তাকিয়া হেলান দিয়ে শ্বশুর মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন। চারপাশে তাঁকে ঘিরে বসেছেন বন্ধুবান্ধব, মোসাহেবের দল। সামনে তাঁর আতরদান, গোলাবপাশের সঙ্গে সোনার আলবোলা। উঠানের সমস্ত গ্যাসব্যাতি জ্বালা হয়েছে।

মজলিস আলোয় আলোময়। বাই সারঙ্গের সঙ্গে মিহি গলায় গান গেয়ে 'তোফা তোফা, ক্যাবাৎ' শব্দের প্রশংসা কুড়োল। ফিরোজা রেশমী ওড়না এক একবার খড়খড়ির আড়াল থেকে চোখে পড়ে। ঘুঙুরের শব্দে বোঝা যায় নাচ হচ্ছে। এবার খ্যামটা আসরে নামল।

আবার কোনদিন শ্বশুরমশায় জড়ি কিংখাবের পোশাক পরে হাতলণ্ঠনওয়ালা বড় ব্রুহামে চেপে যান নেমন্তন্ন বাড়ী। আমি চিকের আড়াল থেকে দেখি। চিকের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে এমনিধারা চেয়ে থাকা আমার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভরু-ঝি আমার ওপরে চোখ রাখে। দেখে মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়। আবার কাছে এসে দাঁড়ায়। ছোট মেয়ের খেয়াল ভেবে কিছু বলে না।

পাথরে চাপা নিঃসঙ্গ দিনগুলো হিম করে দেয় বুকের রক্ত। কথা বলবার লোক নেই। শাশুড়ী কেমন অন্যমনস্ক ভালমানুষ।

নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন। মাঝে মাঝে সজাগ হয়ে ঘর থেকে বা'র হয়ে আসেন। নূতন বৌ আমি, আমাকে আদরযত্ন করে যান মাঝে মাঝে। হাতে করে ভাত খাইয়ে দেন। আমার ভারী লজ্জা করে।

একদিন সন্ধ্যারাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শাশুড়ী ঘরে এসে হাত ধরে তুললেন। মেজেয় শুয়ে তরু-ঝি আমাকে পাহারা দিচ্ছিল। তাকে ডেকে ঘরের মেজেয় আসন করালেন। সাদা পাথরের ওপর পুরু গালিচায় আসন পাতা। বামনী রুপোর থালায় খাবার দিয়ে গেল। শাশুড়ী যশম-পরা হাতে লুচি, মাছ, মিষ্টি আমাকে খাইয়ে দিতে লাগলেন। কানে তালে তালে চৌদান দুলতে লাগল।

বেশভূষায় শাশুড়ী শৌখীন হ'লেও মুখে হাসি নেই। শ্বশুর কদাচিৎ ঘরে আসেন। অনেক সময়ে বাড়ীতেই থাকেন না। বাগানবাড়ী তাঁর আছে বড়লোকদের মত। সেখানে মাইনে-করা মেয়েমানুষ আছে।

টাকার ছড়াছড়ি বাড়ীতে। শাশুড়ী তবু সুখ পান না। কেমন একটা ভীতু ভীতু ভাব ওর দেখা যায়। শ্বশুরের মুখের দিকে ভাল করে তাকাইনি। কড়া রাগী লোক বলে মনে হয়। গোটা বাড়ীর কর্তা তিনি। তাঁর হুকুমে সমস্ত কাজ চলে।

শ্বশুর বাইরের মহলেই বাস করেন। নাচ-গান, আলো-উৎসবের মধ্যে। তবু এক একদিন বৈঠকখানায় বেশী আলো জ্বলে না। লোকজন থাকে না। ভাবশূন্য মুখ নিয়ে চীনেরা আসে টাকা ধার নিতে। ছায়ার মত গতি তাদের, অশুভ প্রেতাত্মা যেন।

খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখি আধো অন্ধকার দালানের জোড়া জোড়া থামের ফাঁকে তাঁদের। সাদা দেওয়ালে মিশিয়ে চলছে চীনে ঝোলা পোশাকে। পায়ের পাতা এত লঘু যে শব্দ পাথরের মেঝেতে বাজে না। মনে হয় জলের স্রোতে ভেসে আসছে তারা, জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। এই জল গঙ্গার জলধারা নয়, শুধু গঙ্গার জলে ভূমধ্যসাগরের ঢেউ লেগেছে। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সমস্ত কিছু।

আমার বুকে সেই অজানা সাগরের ঢেউ লাগছে। থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে বুকের তলা। মনে হচ্ছে, বুঝি আমিও ভেসে যাব, চলে যাব দূর সমুদ্রে। আমাকে কোন তরঙ্গ বয়ে নিয়ে যাবে দূরান্তরে।

তরু-ঝিএর চোখ এড়িয়ে একদিন নাপতিনী এল, তরু-ঝি তখন রাসের পার্বণী আদায় করতে গেছে খাজাঞ্চিখানায়।

নাপতিনী আজ দেড়হাত চওড়া পেড়ে খয়েরী পাড়ের শাড়ী পরে এসেছে। হাসে রেশমী কাঁচের চুড়ি। চুড়ি বাজিয়ে বাজিয়ে পায়ে আলতা পরাতে পরাতে বলল, "নতুন বৌমা, মুখের কাপড় একটু তোল না গো। তোমার পাহারাদারণী তো এখানে হাজির নেই।"

জড়সড় হয়ে একটু মুখ খুললাম। পুরানো লোক নাপতিনী, তায় আবার শাশুড়ীর দাদার সেবাদাসী। ওর কথা অমান্য করা যায় না।

নাপতিনী বলে চলল, "দেখনা বাছা, তোমার শ্বশুরের ব্যাভার। এমন কাঁচা বয়েসে সোয়ামী ছেড়ে থাকা যায়? কি হ'বে বাছা, পাশের পড়া পড়ে যদি যৈবনই চলে যায়? টাকার আণ্ডিল বেঁধে লাভ কি? চোরা কারবারে তো টাকার অপ্রতুল নেই।"

"চোরা কারবার?" হঠাৎ মুখ দিয়ে অজানিতে বা'র হয়ে গেল।

নাপতিনী গালে চড় দিয়ে বলল, "ওমা, কি করনু গো? আমি বাছা, মুখফোঁড় মানুষ। কি বলতে কি বলে ফেলি। তোমার তরু-ঝি শুনলে আমায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।"

অবাক হয়ে রইলাম। এধার ওধার চেয়ে চাপা গলায় নাপতিনী বলল, "তা তুমি বাছা, বাড়ীর বৌ। তোমায় বললে আর দোষ কি? কাউকে বোলনি কিন্তুক। ওই যে চীনেরা না, ওরাই—ওরাই তোমার শ্বশুরের সঙ্গে আফিমের চোরাই ব্যবসা করে। লোকে জানে উনি সুদের লগ্নি কারবার করেন। আসলে বাপু, অন্য কথা। লোক জানাজানি হ'লে সর্বনাশ। মুখটি বুজে শুধু দেখে যাও। এ বাড়ীর মধ্যে দেখার জিনিসের কমতি নেই।"

আমার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করতে লাগল। ঘেন্নায় মন মন বিষিয়ে উঠল। ছি ছি,—বে-আইনী কাজে টাকা করার প্রয়োজন কি? এমন টাকায় দরকার কি? কাকা, এখন আপনি কোথায় আছেন, জানি না। ঠিকই করেছিলেন, এমন বাড়ীতে আমার বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে। যদি আপনি পর না হয়ে যেতেন, তবে এখানে তো আমার বিয়ে হোত না। আমি বেঁচে যেতাম।

আবার মনে ভেসে এল সেই ফুলশয্যার রাত্রিটি। একটি গলার 'মণিমালা' ডাক, একটি ভালবাসার কথা। রাঙা সুতোর ডোর পরা হাতখানা। ভেলভেট জড়িজড়োয়া-মোড়া রাজা। আমার রাজা!"

২৮শে ভাদ্র

ঘরের ভিতর জটলার লোক এখনও জমা হয় নাই। প্রতাপ শেঠকে ডাকিয়া সৌমেন সেন কথাবার্তা সুরু করিলেন। এই সুযোগে কেয়া সোম ছাদের একাংশে নির্জনস্থ হইল।

চীনা পাড়ায় বনেদী বাড়ীর ভিত্তিমূলে হয়তো নানা দেশের জোয়ার লাগিয়াছিল। কেয়া জানে যে বহু পুরাতন বাড়ীর ঐশ্বর্য বৈধ উপায়ে সংগৃহীত হইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দী অনেক দেখিয়াছে। সে দর্শন বিচিত্র।

বহু ধনীর পোষা গুণ্ডার দল থাকিত। বহু ধনী ডাকাতের দলের পাণ্ডা ছিলেন। বাহিরে বিশেষ ভদ্র-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কিন্তু লুটের মাল যথাসময়ে গদিতে পৌঁছিয়া যায়। সাদা ফরাসে ধোপদোস্ত পিরান-পরা বাবুটি, এক হাতে আলবোলার জড়ি-বাঁধা ফুরসী, অন্যহাতে মোম দ্বারা মার্জিত সূচ্যগ্র গুম্ফে তা। দেখিলে বোঝা যায় না যে ইঁহার মাটির নীচে গুপ্ত ভাণ্ডারে লুণ্ঠিত বস্তু জমা হয়। গোপনে যথাস্থানে বিক্রয় হয়, দূরে চলিয়া যায়। ইংরাজের পুলিশ কোন সন্ধান পায় না।

গুপ্ত বা চোরা ঘরে সেকালের বাড়ীগুলি আকীর্ণ থাকিত।

আর থাকিত চোরা সিঁড়ি। সেই সকল পথে যাহা খুশি তাহা ঘটিলেও কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। অতীতে এমনি কত চোরা সিঁড়ির পথে কেয়া ঘুরিয়াছে, অন্ধকূপের কত অন্ধকারে বিলীন হইয়া বন্দীজীবন যাপন করিয়াছে কে জানে! জীবনস্রোত অখণ্ড, অমর সত্তা যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন আধারে আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। এক যুগের ইতিহাস অন্য যুগে পড়া যায় না সত্য। কিন্তু, সে লেখা তো মোছে না। অতীতের সঞ্চয় হইয়া থাকে।

অন্ধকার সরু গলি। দুইপাশে বাঁকা নর্দমা, বাষ্প দূষিত সেখানকার, দুর্গন্ধে বায়ুস্তর কটু। আজকের এই মনোহারিণী বারাঙ্গনা নগরী কলিকাতা গত শতাব্দীতে অন্যরূপ ছিল। পুলিশের প্রাচুর্য ছিল না, রাস্তাগুলি তমোকীর্ণ ছিল।

কেয়া সোমের দৃষ্টি এই গলির পরিধি যেন উত্তীর্ণ হইয়া আরও দূরান্তরের পথিক। কোন পথিক সেই অন্ধকার গলিপথে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল। তাহার নিকট আলো ছিল না। ইতস্তত করিয়া অবশেষে সে গলির অন্ধকারে ঝাঁপ দিল। ঘোর অন্ধকারে চক্ষুহীনের মত তাহাকে পথ চলিতে হইতেছে। একটু পরেই পাশে একটি লোক জুটিল। লোকটি টলিতে টলিতে পথ চলিতেছিল। পথিক মাতাল দেখিয়া একটু সরিয়া গেল। কিন্তু, মাতাল সরিল না। মাতাল তাহার পশ্চাৎ হইতে পাশে আসিল ও অবশেষে পথিকের গায়ে পড়িল। পথিকের হাতের রূপার বাঘমুখো ছড়ি, গায়ের হাঁসিয়াদার শাল, পিরানের পকেট ঘড়ি মাতালের হাতে গেল। মুহূর্তে মাতাল সোজা হইয়া ক্ষিপ্রধাবনে সরিয়া পড়িল।

পাশের গলির দৃশ্য অবর্ণনীয়। সেখানে পথিক আততায়ীহস্তে ছুরিকায় আহত। মাটিতে পড়িয়া গোঙাইতেছে। কাঁচা গলির মাটি আর্দ্র করিয়া রক্তধারা পয়ঃপ্রণালীর ময়লা জলে মিলিতেছে। মানুষের রক্তের দাম সেখানে সামান্য।

চীনেপাড়ার চীনে একটা সুড়ঙ্গপথে কাল কাপড়ে সর্বদেহ

আবৃত করিয়া নিষিদ্ধ মাদক সরবরাহের ব্যবসায়ে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইল।

এই সুড়ঙ্গ মুখোপাধ্যায় বাটীর বাগানের সীমা হইতে গঙ্গাগর্ভ পর্যন্ত গিয়াছিল। বাগানে একটি শুষ্ক কূপ ছিল, কলের জল সরবরাহ হইবার পূর্বে হয়তো ব্যবহার হইত। প্রাচীরের পাশে কূপটি, পাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মাটিতে বসিয়া মাটির বুকে মিশিয়া যাইতেছে। উপরে অনেক গুল্মলতার ঝাড়। সেই কূয়ার ধারে ধারে আংটা, মরিচাধারা লোহার আংটা সিঁড়ির কাজ করিত। সিঁড়ির প্রথায় আংটা বাহিয়া নামিলে গুপ্ত সুড়ঙ্গের রন্ধ্রপথ—সোজা গঙ্গার ধারে চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীন-বাড়ী হইতে সোজা গঙ্গাগর্ভে চোরাই অহিফেনের ব্যবসা বলিত। সরু সুড়ঙ্গপথে গুপ্ত কামরায় দ্বার ছিল, মাটির নীচে লুকায়িত মাদক ভাণ্ডার। গঙ্গার কোন গোপনীয় ঘাটের সহিত পরম বৈষ্ণব মুখুজ্জে বাড়ীর লেন দেন চলিত। লম্বা ছিপ নৌকায় দুর্দান্ত মাঝির দল জলপথে চোরাই কারবার দেশবিদেশে আমদানী ও রপ্তানী করিবার কাজে নিযুক্ত ছিল। চীন দেশের সহিত শুল্ককর ফাকি দিয়া বিরাট ব্যবসা চলিত। সারা কলিকাতায় চীনে পাড়ার আড্ডায় অত্যন্ত সঙ্গোপনে এই সকল নেশার দ্রব্য বিক্রয় হইত। পাড়ার চীনে দলের বাছাই করা লোক ষড়যন্ত্রের হোতো ছিল।

দরজী মুচি হোটেলওয়ালার রূপে চীনেরা কোর্তা পাজামার বাড়ীর দরজায়, দোকানের দরজায়, শিকারীর দৃষ্টি পাতিয়া বসিয়া। আপাত-উদাসীন, সরু সরু ফালি পটলের মত চেরা চোখে মিটমিটে ধূর্ত চাহনি। রাস্তা চলাচলের পথিককে পর্যবেক্ষণ করিতেছে। গ্রাহক কে?

কেয়া সোম অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। এমন একটা সাজানো গল্পের ছক্ মনে মনে বুনিয়া কালক্ষেপে মাদকতা আছে নিশ্চয়। কিন্তু লাভ কি? সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার মানদণ্ড নাই।

কেয়া সোম কবি, কথা-সাহিত্যিক নয়। তাহার দিবাস্বপ্নে কি পরিমাণ খাদ আছে, কতটা আসল থাকা সম্ভব? গবেষণাকারী মন তাহার নয়। পুরাতন একখানি বাড়ী দেখিয়া অস্পষ্ট প্রাচীন জীবন পদ্ধতির ছবি তাহার স্বপ্নালু মন গ্রহণ করিতেছে। সে নিরুপায়।

চীনে দোকান-সারির মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ আঁকাবাঁকা অন্ধকার গলি চলিয়া গিয়াছে। আলিসার ধারে কেয়া সোমের মনে হইল তাহারি দেহচ্যুত আত্মা যেন পথে পথে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে। পথের রহস্য বড় ভয়ানক।

চীনের চোখে পথিকের চোখ মিলিল। উদাসী চোখের পটলচেরায় সঙ্কেতের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। পথিক দুর্বোধ্য চৈনিক ভাষায় কি একটি কথা বলিল।

সঙ্গে সঙ্গে চীনা তেমনি দুর্বোধ্য ভাষায় উত্তর দিল। পথিক আবার একটি কথা বলিল। দরজী দোকানের মেজেয় বসিয়া এক ছোকরা জামার কাপড় কাটিতেছিল। সে উঠিয়া নিকটে দাঁড়াইল। নিঃশব্দে পথিক তাহার পশ্চাতে অন্ধকার পঙ্কিল গলিপথে অদৃশ্য হইল।

মানুষের রক্তে মিশ্রিত থাকে নিষিদ্ধ বিলাসপ্রীতি। তাহারই হস্তনির্দেশে গোপনীয় পথের পথিক হয় মানুষ। চীনে ছোকরার ছিটের কোর্তাপরা মূর্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া পথিক চলিল। নানা গলি অতিক্রম করিয়া একখানা ভাঙা বাড়ীর সম্মুখে তাহারা উপস্থিত হইল। হঠাৎ দেখিয়া হানাবাড়ী বলিয়া ভ্রম হয়; কেহ যে ওখানে কখনও বাস করিতে পারে ভাবা শক্ত।

বাড়ীর পশ্চাৎদিকে গুপ্ত আড্ডা। নানা গলি শূন্য ঘর, কাঠের সিঁড়ি পার হইয়া পরিত্যক্ত নির্জন অংশে পথিককে আনা হইল। যুগান্তের আবর্জনা ও ধূলার উপর পা ফেলিয়া একটা দেয়ালের আড়ালে তাহারা আসিল।

নীচু—বন্ধ ঘরের দরজা দেওয়ালে। চারিদিক বন্ধ। সেই ঘরের

মধ্য দিয়া আরও একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর, পরদা ফেলা, অন্ধকার বিষবাষ্পে সমাচ্ছন্ন। সেখানে আফিমের পাইপ, চণ্ডুর নল সরবরাহ হয়। প্রচুর অর্থের খেলা এখানে।

ঘর প্রায় অন্ধকার। ঘরের ছাদ হইতে ঝুলন্ত কয়েকটি চীনে-লণ্ঠন অন্ধকার দূর করিতে পারে নাই। সমস্ত বাতাস বিষের ধোঁয়ায় মন্থর; বিষাক্ত গন্ধে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া উঠে। এই গুহায় নিষিদ্ধ মাদক সরবরাহ, এইখানে নিষিদ্ধ জুয়াখেলার আড্ডা। এখানে হত্যা অপেক্ষা করিয়া থাকে, ব্যভিচার নিত্যনব রূপে দেখা দেয়। গুপ্ত নেশার অড্ডায়, গুপ্ত ষড়যন্ত্রে কেয়া সোম কেন? ওই পথিক কি কেয়া সোম, না? হ্যাঁ, ওইতো চাঁদের মত ত্রিকোণ ললাট, সাদা মোমের মত কানে সোনার কান-পরা। কেয়ার ক্ষীণ হাত দৃঢ়মুষ্টিতে কে যেন ধরিয়া সমগ্র কদর্য পরিবেশের সঙ্গে তাহাকে একীভূত করিতেছে। লণ্ঠনের আলোয় কেয়া সে ব্যক্তির মুখ দেখিতে চেষ্টা করিল। লোভে ও লালসায় মুখখানা বিকৃত। একটি চীনে মুখ।

"উঃ!" কেয়ার মৃদু আর্তনাদে পার্শ্ববর্তী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "হাতে লাগল না কি?"

কেয়ার আলিসার উপরে রক্ষিত ক্ষীণ শুভ্র হাতের উপর সবল বাহুর প্রক্ষেপণে কেয়ার বোধহয় ব্যথা লাগিল।

"এখানে আপনার হাতটা দেখতে পাইনি। মাপ করবেন, মিস সোম।" কেয়া হাত সরাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পার্শ্ববর্তী আগন্তুকের মুখের দিকে লক্ষ্য করিল। দিবা-স্বপ্নে এই মুখখানাই সে এতক্ষণ দেখিতেছিল বোধহয়? কিন্তু উচ্চবংশীয় সুপুরুষ তরুণের মুখ আর চীনে বদমাশের মুখ এক নয়।

চীনে পাড়ার গলিগুলি অব্যক্ত রহস্যের প্রতীক যেন। নীচে মানচিত্রের মত বিস্তৃত বাড়ীঘরের দিকে কেয়া সোম চাহিয়া চাহিয়া ভাবিল, এক শতাব্দী অথবা অর্ধশতাব্দী পূর্বে যে নাটক এখানে অভিনীত হইত, আজও কি তাহার ক্ষীণ-প্রতিধ্বনি রাজধানীর ইট

ও কংক্রীটে কখনও বাজিয়া ওঠে? তাহার মত কোন কোন সত্তা কি অতীতের স্মরণাভাসে এমনি অন্যমনা হইয়া যায়?

"কি ভাবছেন একা একা এখানে পালিয়ে এসে?"

প্রতাপের প্রশ্নে কেয়া উত্তর দিল, "ভাবছি আমাদের আগে এই সমস্ত পুরনো বাড়ীর, পুরনো গলির জীবন বা কেমন ছিল।"

প্রতাপ হাসিয়া বলিল, "চীনাদের না কাঙালীদের?"

"দুটো জীবনই তো পাশাপাশি চলত। বিদেশী যারা এখানে টাকা কুড়োতে এসেছিল তারা, আর যারা প্রাচীন বাসিন্দে, তারা।"

প্রতাপ বংশগৌরব স্মরণ করিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "আমাদের বংশ বহু পুরাতন। আমরা বিদেশীর ধার ধারতাম না। আমাদের নীলের কুঠী ছিল। কিন্তু পাশের নীলকর সাহেব নানা ছল দেখিয়ে সেগুলো কেড়ে নেন। মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমায় তিনি আমাদের পূর্বপুরুষকে জড়িয়ে ফেলেন। সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পক্ষ নেওয়ায় আমাদের বাধ্য হয়ে নামমাত্র দামে সেগুলো নীলকর হ্যারিক সাহেবের কাছেই বিক্রি করতে হ'ল। তবে দর-পত্তনী তালুকগুলো রয়ে গেল।"

কেয়া সোম বলিল, "আমি কিন্তু পুরনো বইতে পড়েছি আপনার পূর্বপুরুষ কম্পানির দালাল ছিলেন।"

কেয়া সোম প্রতাপের পূর্বপুরুষের ইতিহাস পাঠ করিয়াছে এজন্য প্রতাপ গৌরব বোধ করিল। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে অস্বস্তির ভাবও উদয় হইল। কম্পানি অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি ১৬৯৮ সালে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা আলমগীরের পৌত্র আজিম-উস্-শানের নিকট হইতে ক্রয় করেন। সেই ভাগীরথী তীরবর্তী ক্ষুদ্র ব্যবসা-প্রধান স্থানে বহুপূর্ব হইতেই আরমানী, পর্তুগীজ, ইংরেজ ও দিনেমার বণিকগণ ইউরোপের নানা দেশ হইতে আসিয়া সুতানটির হাটে বস্ত্র ও সূতা কিনিয়া নিজেদের দেশে চালান দিত। চাঁদসওদাগরের সপ্তডিঙা মধুকর এই কলিকাতার জাহ্নবীতীর স্পর্শ করিয়াছিল।

বহু দিনের বহু লোভীর কামনা ক্ষেত্র ভাগীরথ-মেখলা কলিকাতা নগরী। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির প্রিয়পাত্র কেন প্রতাপ শেঠের পূর্বপুরুষ হইলেন, সে এক নিগূঢ় তথ্য। কেয়া কি জানে? প্রতাপ ধীরে ধীরে বলিল, "আমার পূর্বপুরুষ আর বসাকেরাই কলিকাতার সকলের চেয়ে পুরনো বাসিন্দা। সতরো শতাব্দীতে ওঁরা প্রথম সপ্তগ্রাম থেকে এসে সূতানুটিতে বাস করেন। তাঁরাই প্রথম সূতানুটির হাটের পত্তন করেন। তাঁতিদের মধ্যে বাস করতেন তাঁরা —কম্পানির ওঁদেরকে বাদ দেবার উপায় ছিল না। চিরদিন কম্পানির সঙ্গে ওঁদের ব্যবসা-সম্পর্ক ছিল।" কেয়া সোমের একাগ্র মুখের দিকে চাহিয়া প্রতাপের মনে কত আনন্দ হইল! তবে তো কেয়া তাহাকে পছন্দ করে। প্রতাপের বংশাবলীর বিষয় শুনিতে যখন কেয়ার এত আগ্রহ।

প্রতাপ সাগ্রহে বলিতে লাগিল, "একজন পূর্বপুরুষ বিলিতী জাহাজের বেনিয়ান হয়েছিলেন। যতদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি এদেশে ছিল, তিনি প্রায় সমস্ত জাহাজগুলোর মাল এদেশে বিক্রির ব্যবস্থা করে দিতেন। আমাদের টাকার মূল সেখানে।"

অর্থাৎ বিদেশীর অনুগ্রহ। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রতাপ শেঠের দল ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি অথবা বিদেশী বণিকের আনুগত্য বা প্রসাদ গ্রহণ স্বীকার করিতে ভালবাসে না। কেয়া মনে মনে হাসিয়া বলিল, "মতিলাল শীলও তো এই ধরণের কাজে টাকা করেছিলেন না?"

"হ্যাঁ। শীলেদের সঙ্গে আমাদের বাড়ীর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে শুনেছি। মতিলাল শীল পরে অবশ্য জাহাজ তৈরীর ব্যবসা ধরলেন। ওঁর ছোট বড় বার তেরখানি জাহাজ হয়েছিল। কলিকাতায় তৈরি তার বড় মেয়ের নামে 'রাজরাণী' জাহাজে আমাদের বাড়ীর সকলে গঙ্গাসাগর গিয়েছিলেন। আপনি সেকেলে কথা খুব ভালবাসেন দেখছি।"

কেয়া বলিল, "কয়েকদিন হ'ল ভাল বাসছি, দেখা যাচ্ছে। আগে অবশ্য কেবল তথ্যের খাতিরে প্রাচীন পুঁথি নাড়াচাড়া করতাম।"

এই বাড়ীতে পদার্পণ মাত্রে কেয়ার অতীতকে জানিতে বাসনা হয়। কেয়ার পায়ে পায়ে পদচারিণী অতীত নূপুর-পায়ে ফেরে। অশ্রুত ঝঙ্কার কানে ভাসে কেয়ার। রূপসী, ষড়ৈশ্বর্যময়ী কলিকাতার বিলুপ্ত অতীত। তখন কলিকাতা কি? সরল পল্লীগ্রাম নয়, বিদেশী বণিকের দল তাহাকে ভজনা করিতেছে, অথচ কম্পানির আমলে এখানকার মত সুরক্ষিত নয়। অতএব পাপের কাজল তাহার চোখে ছিল গভীরতম রেখায় রেখায়।

কেয়া বেশী কথা বলে না। সুতরাং কেন যে সে মাত্র কয়েকদিন হইল অতীতকে জানিতে চাহিতেছে, জিজ্ঞাসার সাহস হইল না শেঠের। তবে কি প্রতাপ শেঠকে জানিয়া কেয়া সোম অতীতকে জানিতে চায়?

বক্ষ স্ফীত করিয়া প্রতাপ আলিসায় হেলান দিয়া সোজা দাঁড়াইল। বিদ্যায় সে বিদুষীর অপেক্ষা অধম সন্দেহ নাই, কিন্তু কলিকাতার অতীত সম্পর্কে কেয়াকে সে পাঠ দিতে পারে। কারণ কলিকাতার অতীত যে প্রতাপ শেঠের বংশেরও অতীত। এই যে বাড়ীতে তাহারা অফিস খুলিয়াছে, প্রাচীন মুখোপাধ্যায় পরিবার এখানে থাকিতেন। শেঠ বংশ মুখুটিদের মত কয়েক পুরুষে বড়লোক 'হঠাৎ বাবু' নয়। গঙ্গায় অর্ধ নিমজ্জিতা, খালখন্দাকীর্ণা, জঙ্গলপূর্ণ অধুনা কলিকাতা নামে বন্দরের উত্থানের সঙ্গে সম্ভ্রান্ত শেঠ বংশ জড়িত। ১৬৯০ খৃস্টাব্দের ২২শে আগস্ট জব চার্ণকের চারখানি বাণিজ্য-পোত সন্ধ্যার ম্লান কুয়াশায় সূতানুটীর ঘাটে লাগিল। অন্ধকার বনের মধ্য হইতে বুনো শূওর আর্তনাদ করিতেছিল। গভীর রাত্রে আরও দূর হইতে বাঘের গলার ডাক ভাসিয়া আসে। দুইধারে গোখুরা সর্পের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যায়। পণ্যপোতময়ী গঙ্গায় কয়েকখানি নৌকা মাত্র

তখন অসহায় ভাসিতেছিল। তীরে তাঁতিদের সামান্য কয়েকখানি কুঁড়েঘর। দীর্ঘ তৃণভূমির বুকে নারিকেল তাল গাছ। শোভারাম বসাকের সূতার হাট এখন জনশূন্য। ভাগীরথীর বাতাসে দূর সাগর কল্লোল সূতানুটিকে নূতন জীবনে আহ্বান করিতেছে। অন্যপাশে ধাপার লোনা হ্রদ। চিৎপুরের খাল হইতে বড়বাজার সূতানটি, জব চার্ণকের লক্ষ্য। কাষ্টম্ হাউসের ধার ছিল 'কলিকাতা মাঠের দক্ষিণ পর্যন্ত 'গোবিন্দপুর'। এই কলিকাতার প্রাচীন মানচিত্র প্রতাপ শেঠের বাড়ীতে প্রলম্বিত আছে। ভবানীপুর দুর্গম স্থান ছিল, চৌরঙ্গীর জঙ্গলে জঙ্গলগীর নামে সন্ন্যাসী বাস করিতেন। শহরের বাহিরে শহরতলী বলিয়া চৌরঙ্গী বহুদিন গণ্য হইত। পাল্কী বেয়ারা দ্বিগুণ ভাড়া হাঁকিত। ডাকাতের ভয়ে পথচলা দায় হইত সন্ধ্যার পরে। বাঘের গায়ের গন্ধে বাঁশঝাড় পরিপূর্ণ থাকিত। কালিঘাট তীর্থের পথ এই বন্যভূমির মধ্য দিয়া।

সেদিন কলিকাতার সম্পদ কি ছিল, যেদিন জবচার্ণক তৃতীয়বার সূতানুটির হাটে ভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করিলেন? কয়েকখানি মেটে ঘর বাদা বন। চার্ণক যে দুই একখানি পর্ণকুটির পূর্বের বার নির্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ভস্মসাৎ। অতএব তীরে আশ্রয় লইবার উপায় ছিল না। জাহাজে তাহাদের সেদিন রাত্রি অতিবাহিত হইল। ভারতের মাটি বিদেশী বণিককে আশ্রয় দেয় নাই সেদিন। কিন্তু জব চার্ণক অপ্রতিহত।

জব চার্ণক আধুনিক কলিকাতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ইতিহাস বলে। কিন্তু, প্রতাপ জানে কলিকাতার হৃৎপিণ্ড পদদলন করিয়া শেঠ বংশ বহুপূর্বে বন্দরীর সমৃদ্ধি নিজভাণ্ডারের লৌহ পেটিকায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

শহরের কেন্দ্রে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া 'বাগ' বসাইলেন শেঠবংশ জব্ চার্ণকের পূর্বে। সাবর্ণ চৌধুরীদের বিগ্রহ 'শ্যাম

রায়ের' প্রসাদ বিতরণের চন্দ্রাতপের নিম্নে জাহ্নবীমগ্না সূতানুটি হয়তো প্রথম চোখ মেলিলেও 'গোবিন্দপুর' শেঠ বিগ্রহের নামে উৎসর্গীকৃত। জব চার্ণক আজ সেন্ট জন গির্জার সমাধিক্ষেত্রে চির-নিদ্রিত। কথিত আছে তাঁহার হিন্দু-স্ত্রীও সেখানে সমাধিস্থ। বিদেশী চার্ণকের বংশ প্রদীপ হয়তো নির্বাপিত। শেঠ বংশের প্রতাপ কিন্তু আজও উদিত।

জব চার্ণকের বিশ্রাম-স্থল বৃক্ষ-তলায় 'নব বৈঠকখানার' প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তবু বড়বাজারের পার্শ্ব হইতে পুরাতন দুর্গ পর্যন্ত 'শেঠবাগান' আস্তৃত। কোন লতাপাতায় গাঁথা সূত্রে শেঠ বংশে প্রতাপের স্থান হইয়াছে, জানে না সে! হয়তো যোগসূত্রও কাল্পনিক। কিন্তু, প্রতাপ জানে জব চার্ণক কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতৃ নয়—প্রতাপের পূর্বপুরুষের হাতে মথিতা দলিতা কলিকাতা সোনার ফসল তুলিয়াছে। জন্ম হইতে কলিকাতার প্রাণস্পন্দন শুনিয়া, গঙ্গার জলে সাতডিঙি মধুকরের পসরা মেলিয়া বাণিজ্যযাত্রা করিয়াছে চির সওদাগর শেঠ বংশ। বিদেশীরা তাহাদের বাণিজ্যদূত। ইংরাজ, চীন সকলেই তাহাদের বন্ধু। এখন বন্ধু মারবারদেশী, যাহাদের অনুকরণে তাহার পিতার নাম 'মনোহর শেঠজী'।

কেয়া সোম প্রতাপের নীরবতা লক্ষ্য করিল। যাহার অন্য মর্যাদার বাহন নাই, সে বংশকে প্রাধান্য দেয়। নূতন বড়লোক সাজিতে চায় না প্রতাপ, যদিও তাহার পিতা ব্যবসার দায়ে অবাঙালী সাজিয়াছেন। প্রাচীন বংশের রীতিনীতির কথা অবগত আছে প্রতাপ। পিতামহ তাহাকে নিজেদের বংশ-তালিকা ও পূর্বকাহিনী শিক্ষা দিয়াছেন। প্রতাপ জানে কলিকাতার অতীত তাহারও অতীত।

প্রতাপ বলিল, "জানেন মিস সোম, হাজার বছর আগে এখানে শুধু জল ছিল—সমুদ্র। শহরের চিহ্ন ছিল না। জঙ্গলে বাঘ

সাপের সঙ্গে কোল জাত, ব্যাধ, চাঁড়াল, জেলে এরাই থাকত বেশী বেশী। বুঝুন মিস সোম, এখানে শুধু জল ছিল।"

জলের বুকে জাহাজ চলিত বুঝি? সেই জাহাজের দোলা কেয়ার বুকে, কেয়ার রক্তে। সহসা বেখাপ্পা প্রশ্ন করিয়া বসিল কেয়া, "আচ্ছা, মতিলাল শীলের জাহাজগুলো কোথায় যেত?"

প্রতাপ বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, "বাণিজ্য করতে যেত—ইউরোপে, চীনে।"

"চীনে কেন? চীনে কেন?"

"চীনে তো ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি ছিল আঠার শো চৌত্রিশ সাল পর্যন্ত। লেন-দেন ছিল। ওকি, মিস সোম, কাঁপছেন কেন?"

"না, কাঁপছি না। হেলান দিলাম মাত্র। আচ্ছা, এই চীনেরা নিশ্চয় কলকাতায় বাসা গেড়েছিল সেই সময় থেকে ইংরেজদের মারফত?"

"না, শুধু তাই কেন? নিজেরাও এসেছিল।"

কেয়ার শরীর এখনও যেন মৃদু কম্পিত। এক মুহূর্তে সে যেন দেখিল জাহাজের বদ্ধঘরে সে আবদ্ধা—চীনগামী জাহাজ। সেখানে একজন সাহেব। বিচিত্র বেশ তাহার। মসলিনের কামিজ, ঢিলে পায়জামা, সাদা টুপি। মুক্তার ছিন্ন সরস্বতী হার কণ্ঠে কেয়ার গজমতির নোলক নাকে। কিন্তু, সিঁথিপাটি-ঝাপটা ঢাকা মুখখানি তো ঠিক কেয়ার নয়। কোনে চন্দনপরা, ছোট ত্রিকোণ ললাটখানি যেন কার? আজ রাত্রি জাগরণের সঙ্গে সেই মুখখানি কেয়ার স্বপ্নজগৎ হইতে স্খলিত হইয়া শয়ন সিথানে তারার মত ফুটিয়া ছিল। সেই সত্তার সর্ব অনুভূতি কেয়ার শিরায় শিরায় অনুভূত হইলেও সোনার কান-পরা মুখখানি কেয়ার নিজের নয়। কিন্তু চেনা মুখ। কেয়ার নিজের মতই চেনা।

প্রতাপের পিছন হইতে এতক্ষণে আহ্বান আসিল, "সবাই যে বসে আছেন। প্রতাপ, তোমরা আর কতক্ষণ গল্প করবে?"

সৌম্যেন যেন ততক্ষণ সুযোগ সম্ভব দিয়াছেন। তির্যকদৃষ্টি প্রতাপ কেয়ার সান্নিধ্য লক্ষ্য করিয়া এতক্ষণ অন্যদের নানা ছুতায় নিবৃত্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতাপের টাকার বড় প্রয়োজন ফিল্ম-কম্পানির। কেয়া সোম চুম্বক-পাথর।

কেয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, কয়েকদিন হইল তাহার শান্তি এইভাবে দিবাস্বপ্নে, উৎকট কল্পনায় ব্যাহত হইতেছে। নানারূপ অসম্ভব চিত্র তাহার চোখের সমুখে আপনা-আপনি ভাসিয়া আসিতেছে। তাহার রাত্রিগুলি স্বপ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল। এলোমেলো ছেঁড়া-ছেঁড়া ছবি সব। কিন্তু, বার বার একই ছবি ফিরিয়া ফিরিয়া আসে কেন? কি বলিতে চায় তারা? যেন তারা অসংলগ্ন চিত্র নয়। একটি গল্পের খণ্ড খণ্ড অংশ মাত্র।

কেয়া আস্তে আস্তে ঘরে আসিয়া বসিল। অমল রায় ও শান্তি সেনের গল্প পড়িবার উদ্যোগ হইতেছে চিঁড়েভাজা, কাট-লেটের সহিত চায়ের পাত্র লইয়া।

এখনি হয়তো গোরার জাহাজ, চীনে আড্ডা মিলাইয়া যাওয়া পটভূমিকায় কাঁদুনে-সুরের বেহালা বাজিয়ে উঠিবে। কোন এক ছিঁচ-কাঁদুনে মেয়ের দিনপঞ্জীর পাতা উড়িবে কেয়ার চোখের সামনে। সে ছবির মত শুধু দেখা দেয় না, কালির অক্ষরে অতীতের গাথা লিখিয়া দেয়।

কে এই মেয়েটা? এমন বনেদী বাড়ীর বৌ হইয়া তাহার কি অন্য কোন কর্তব্য ছিল না, খাতার পাতায় ঘ্যান্‌ঘেনে জীবনী লেখা ভিন্ন? একা কেয়া সোম কতদিন সামলাইবে? মানুষের প্রত্যক্ষ বাস্তব-জীবনের উর্ধ্বে অন্য কোন জীবনের আবছা ছবি হয়তো বিস্মরণী কুয়াশার মধ্যে, কখনও বা তীক্ষ্ণ-মনীষী সত্তার কাছে ভাসিয়া আসে। কিন্তু এমনভাবে উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় বিক্ষিপ্ত চিত্র! হায় কেয়া, তোমার মন যে এত চিত্রগ্রহণসক্ষম, তুমি কি জানিতে আগে? তোমার অনুভূতি যে এত ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম,

তুমি ভাবিতে পারো নাই। অতীত কেবল তোমারি কাছে মুখ খোলে। এখনও পলায়ন কর, কেয়া, অতীতের রহস্যমোচন তোমার পক্ষে সুখকর নয়।

অসহিষ্ণু কেয়া নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। আর তাহার পলায়নের সামর্থ্য নাই। সে ভগ্ন, সে পরাজিত। এই বাড়ী, এই গলি নাড়ির সহিত বাঁধা—জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন। বিগত শতাব্দীর মৃত সত্তা কেয়ার শরীর আশ্রয় করিয় প্রাণ পায়। ভূতের কোন অবলম্বনে প্রকাশ হয়।

কিন্তু, গল্প কি শুধু একটাই? বিংশ শতাব্দীর বুকে উনবিংশ শতাব্দী করুণ আঙুলে ইতিহাস লিখিয়া যায়—প্রাচীন মুখোপাধ্যায় পরিবারের বালিকা বধূর করুণ ইতিহাস। কমনীয়ার চারিপাশে চীনেগলির বিষবাষ্প। কিন্তু, আরও যে একটি গল্প কেয়ার স্বপ্নে ধরা দিল? ফুল-ঝরার মত সকরুণ বেদনা অষ্টাদশ শতাব্দীর পাদ-মূলে সঞ্চিত আছে। দুই শতাব্দী ব্যাপিয়া কাহার বেদনা আজ কেয়াকে গান গাহিতে বলে?

বালিকা বধূর গল্প চীনে-আড্ডার গল্পে মিশিয়া চলে গলির কোণে কোণে। আর একটু দূরে সাহেবের বজরায় দেখা মেলে আরও একজন লাঞ্ছিতার। চীনের হাতে ধরা ক্ষীণশুভ্র মণিবন্ধ আর সাহেবের পদলুণ্ঠিতা মেটে-লাল বেনারসী। দুইটি কাহিনীর যোগ-সূত্র কোথায়? অক্ষম কেয়া, সামান্য কেয়া কি মালা গ্রথিত করিতে পারিবে? এত উপকরণ তাহাকে উপহার দিয়াছে মৌন অতীত!

"নিন ধরুন একখানা। আজ ক্যান্টিনে ভাল মুর্গির কাটলেটের অর্ডার ছিল।" সঙ্গীত-পরিচালক একখানা কাটলেট প্লেটে তুলিয়া কেয়ার সামনে রাখিলেন। কেয়া ভদ্রতার খাতিরে হাতে তুলিয়া লইল।

সারা বাড়ীর স্নায়ুতে যেন চমক লাগিয়া বাড়ীখানা নড়িয়া উঠিল। কেয়া নিজেকে অনেক দূরে দেখিতে পাইল।

নীচু একখানা ঘরের ছাদে লণ্ঠন ঝুলিতেছে। মধ্যে টেবল ঘেরিয়া কয়েকজন নেশাখোর। সরু নল লাগানো একটা যন্ত্রে তাহারা মাদকদ্রব্য সেবন করিতেছে। দেওয়ালে ঠেসানো বেঞ্চে পাইপ হাতে কেউ কেউ ঝিমন্ত। চট-ফেলা রান্নাঘরে মাংস রান্নার ঘ্রাণ এখানে ভাসিয়া আসিলেও আফিমের গন্ধে এ ঘরের বাতাস মূর্চ্ছিত।

ফুলকাটা সাদা কাঁচের থালায় এমনি কাটলেট—হ্যাঁ, ঠিক এমনি। হাতে করিয়া টেবিলে থালা রাখিতেছে একটি ক্ষীণ-শুভ্র হাত। সেই অপসৃতমান হাতখানা টানিয়া ধরিল রুক্ষ আর একটি হাত—পীত হাত, হরিদ্রাভ-শুষ্ক।

দেয়ালের গায়ে ঝিমানো লোকগুলির মধ্য হইতে টলিতে টলিতে একজন এবার সম্মুখে আসিল। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক চীনে একজন। এই ছাদ, দেওয়াল, বাড়ীর প্রাচীর পার হইয়া অনেক দূরের রাজত্ব সেটা। কিন্তু, আশ্চর্য হইয়া অশ্রুত কথা শুনিতেছে কেয়া সোম। চীনে ভাষার মানে বুঝিতেছে কেয়া সোম অনায়াসে।

যুবক চীনে বলিল, "সর্বদা কেন ওকে টানাটানি কর? ও তোমাকে চায় না, তুমি জানো ভাল করে। অযথা অশান্তি বাদ দাও। আমাদের মধ্যে যে কোন লোককে ওর পছন্দ, ও বেছে নিক না।"

এবার তরুণীর হাত ছাড়িয়া প্রৌঢ় চীনে চীৎকার করিয়া উঠিল, "তা বই কি। কত কষ্ট করে ওকে আমি এখানে এনেছি, জান বাছা? পুলিশের হাতে পড়লে রক্ষা থাকত না। এখন ভাগ চাইলে চলবে কেন?"

"ভাগ আমি চাইছি না। দলের নিয়ম আমি জানি। আড্ডার একটা জিনিস হয়ে থাক না মেয়েটি। তোমাকে যখন চায় না, তখন ওকে আগলে ঘিরে লাভ কি?"

দাঁত-ভাঙা এক থলথলে মোটা বুড়ী চিংড়ির ঠ্যাং-ভাজা ভরা বাটি টেবলে নামাইয়া কুৎসিত হাসির সঙ্গে কি যেন বলিল। কেয়ার কাছে অবোধ্য তাহার কথা।

প্রৌঢ় চীনে ঝোলা কোর্তার আস্তিন গুটাইয়া যুবক প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে অগ্রসর হইল, "আমার চোখে ধুলো দিয়ে মেয়েটাকে ভোগ করবি, না? প্রাণের মায়া ছেড়ে ওকে এনেছি, তা জানিস? প্রথম দিন থেকেই তোর চোখ ছিল ওর দিকে, আমি টের পেয়েছি। ওকে আজই আমি এই আড্ডা থেকে উধাও করে ফেলব, দাঁড়া। তোর মত কুকুর ওর নাগাল পাবে না সেখানে। আমাকে চিনিস্ না তুই।" চীনে থু-থু করিয়া মেজেতে খানিকটা থুথু ফেলিল।

কেয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। পলাইবার পথ নাই। ঘরের একমাত্র দরজার মুখ বন্ধ করিয়া মোটা বুড়ী কোমরে হাত রাখিয়া মজা দেখিতে মত্ত।

চীৎকার শুনিয়া পাশের ঘরের জুয়াড়ীরা জমা হইতেছে। কাহারও হাতে নোটের তাড়া, কাহারও হাতে আধুলি সিকি।

যুবক চীনে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তোমাকে আবার চিনি না? এমন সুন্দর মেয়েটাকে তুমি মারধোর পর্যন্ত কর। তবু তো বশ করতে পারছ না! তুমি বুড়ো, তুমি কুচ্ছিৎ। অমন মেয়ে তোমাকে চাইবে কেন? শোন লিপো, বেশী বাড়াবাড়ি কর তো মেয়েটির শ্বশুরবাড়ী যেয়ে খবর দেব। ওর শ্বশুরের তুমি যত বড় মহাজনই হও না কেন, যে সমস্ত কাজ করেছ তুমি, জানলে ছেড়ে কথা কইবে না সে। তুমি ফাঁসিকাঠে ঝুলবে— এই এমনি করে ঝুলবে। দোল, দোল। বুড়োর হাড়ে দড়ি বসলে হয়।" যুবক অঙ্গভঙ্গিসহ ফাঁসির দোলা দেখাইয়া হা-হা স্বরে উচ্চ হাস্য করিল। তারপর দুই হাতের বুড়ো আঙুল প্রৌঢ় চীনের মুখের সামনে নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "তখন এই কুকুর তোমার সুন্দরীকে ভোগ করিবে। তখন!"

সমবেত হাস্যের মধ্যে লিপোর বীভৎস মুখে শয়তানের ছায়া দেখিয়া কেয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিল। হিংস্র জন্তুর পশুত্বে চোখ তাহার জ্বলিতেছে। কোর্তার বুক হইতে এক মুহূর্তে সাপের মত ছুরির ফলা চিকমিক করিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে যুবক চীনে চীৎকার করিয়া মেজেতে পড়িয়া গেল। আর্তনাদ, আহতের মৃত্যুচীৎকার, চেঁচামেচির মধ্যে ছাদের লণ্ঠন কে যেন এক ঘায়ে ভাঙিয়া ফেলিল। গভীর অন্ধকার রাজ্যে তখন কেবল পলাইবার তাড়া।

"পালাও, পালাও! খুন হয়েছে, খুন! এ উহাকে ঠেলিয়া, এ উহাকে টানিয়া সঙ্কীর্ণ দরজার পথে কাঠের সিঁড়ির মুখের দিকে ছুটিতে লাগিল। মোটা স্ত্রীলোকটি জনতার ধাক্কায় একপাশে পড়িয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিতেছিল। চীনে-পোশাক-পরা কেয়ার চীনে স্ত্রীলোক-পুরুষের ভিড়ে মিশিয়া যাওয়া সহজ। সেই রাত্রে কেয়ার পলায়নে বাধা হয় নাই। তারপর?

স্বপ্নাচ্ছন্ন কেয়ার হাতের কাটলেট প্লেটের উপর খসিয়া পড়িল।

নৃত্য পরিচালক বলিলেন, "কি হ'ল, খেলেন না? এতক্ষণ মুখের কাছে শুধাশুধি ধরেছিলেন কেন, বলুন তো?"

সঙ্গীত পরিচালক হাসিলেন, "ওটা মিস সোমের একটা বিশেষ ভঙ্গি। আমরা চিরকাল ওঁর উন্মনা ভাব দেখে এসেছি। কিন্তু, এবারে যেন বেশী বাড়াবাড়ি হয়েছে।"

কেয়ার সর্বশরীর কম্পিত হইল। চোখের সামনে একখানা কদাকার মুখ অতি স্পষ্টতায় এক মুহূর্তে ফুটিয়া উঠিয়া আবার অদৃশ্য—চীনে মুখ। অশুভ আত্মার মত হলদে, মড়া মুখখানা বায়ুস্তরের নিরলম্ব শূন্যে সামান্য কিছুক্ষণ ঝুলিয়া অদৃশ্য হইল।

"ওকি ওকি? কি হ'ল?" সঙ্গীত ও নৃত্য-পরিচালক সমস্বরে বলিলেন।

রক্তশূন্য মুখে দেওয়াল ধরিয়া কেয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "আমি বাড়ী যাই। শরীরটা খারাপ লাগছে।"

যন্ত্রচালিত স্প্রিংয়ের ন্যায় অন্যদিক হইতে উঠিল প্রতাপ—"আমি পৌঁছে দিয়ে আসি। সত্যই ওঁর শরীরটা খারাপ। আর একবারও লক্ষ্য করেছিলাম।"

সৌমেন সেনের অধরে সূক্ষ্ম হাসির রেখা।

বাহিরে আসিয়া কেয়া বলিল, "আমি একাই যেতে পারব। আপনি ফিরে যান। ওঁরা সবাই বসে আছেন। গল্প পড়া হচ্ছে।"

"তা কি হয়? এমন অবস্থায় আপনাকে আমি একা ছেড়ে দেব না। চলুন।"

অবসন্ন বিষাদে কেয়া সোম গাড়ীতে উঠিল, "জানি, আপনি যা বলছেন আমাকে শুনতেই হ'বে।"

কেন? তবে কি—প্রতাপের অনুসরণ সার্থক? সুন্দরীর মনের প্রান্তে দক্ষিণা বাতাস লাগিয়াছে, একটু সজল মেঘ সাহারা-গগনে দেখা দিয়াছে, কোন অশোক তরুর দেহক্ত সম্পাদিত।

প্রতাপ কেয়ার পাশে বসিল। আজ আর গঙ্গার ধারে গাড়ী চলার অনুমতি-অপেক্ষা সে রাখে না। সুদূরসঙ্গিনী যেন কাছে আসিল, যেন এখনি প্রতাপের বাহুর বন্ধনে ধরা দিতে পারে। কিন্তু, প্রতাপ কি চায়? কৃতদার সে। নইলে কেয়া সোমকে হয়তো প্রতাপ শেঠ গৃহে আনিত। গৃহে আনিত কি? যে শালীন রুচি প্রতাপের স্থূল চেতনাকে মোহিত করিয়াছে, প্রতিদিন ব্যবহারের সীমানায় সেই রুচিকে আনিতে প্রতাপ ভয় পায়। কয়েক ঘণ্টার জন্য ভদ্রলোক সাজা সম্ভব। কিন্তু কেয়া কি জানে, আহারের পর দাঁত খোঁটান প্রতাপের মজ্জাগত, অনাবৃত দেহে শিথিল ধুতির সাজ প্রতাপের নৈমিত্তিক। প্রতাপের মা উগ্র ক্রোধী, বাড়ীর চূড়ায় কাক চিল বসার পক্ষে তাঁহার অমার্জিত, কর্কশ কণ্ঠস্বর প্রতিকূলে। প্রতাপের বাবার অর্থ কালবাজারের পথে গৃহে প্রবেশ করে। প্রতাপের ছোট ভাই বারবণিতার অঞ্চলনিধি।

প্রতাপের বধূ পান-জরদা-সিক্ত লালাস্রাবী ঠোঁট নাড়িয়া পিত্রালয়ে দাসীর সঙ্গে অশ্লীল গল্পে মুখর। নীরু না থাকিলেও প্রতাপের ঘরে কেয়ার উপস্থিতি বেমানান।

কেয়াকে উপভোগ করিবার সুখ প্রতাপের জীবনে আসে কি না সন্দেহ। কেয়াকে প্রতাপ ভালবাসে না, অনুসরণ করে মাত্র। এই যে মোটরের টায়ারের তলায় বারবার প্রশ্ন বাজিতেছে: কেন? কেন? কেয়া সোমকে, তুমি প্রতাপ শেঠ, কি ভাবে চাও? কেয়াকে ভোগ করিতে চাও? কেয়ার প্রতি তোমার নিষ্ঠুরতা আছে। তুমি কেয়াকে শুধু ভোগ করিতে চাও না, সুবিধার জন্যও ব্যবহার করিতে চাও। কি সুবিধা, তাও বুঝি বুঝিতে পার না, কিন্তু কেয়াকে হাতছাড়া করা চলে না তোমার পক্ষে। কোন্ আকর্ষণ তোমাকে কেয়ার পাশে বাঁধিয়া রাখে?

সাবলীল গতির গাড়ী গঙ্গার কূলে পৌঁছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির আমলে গঙ্গা নয়—ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া স্ট্রীট হইতে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, অতঃপর চিৎপুর, আহিরীটোলা, বড়বাজার, বাগবাজার।

"গঙ্গার ধারে এলেন্ কেন? ক্ষীণ স্বরে কেয়া প্রশ্ন করিল।

প্রতাপের স্বরে গঙ্গার জোয়ারের জোর লাগিয়াছে—"এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ী ঢুকে বসে থাকলে শরীর ভাল হয় না। সেদিন গঙ্গার ধারে এলেন না, আজ আসতেই হ'ল। এদিকটা নোংরা। তবু কাছে পড়ে বলে এলাম।"

গঙ্গার ধারে প্রতাপ কেয়াকে আনিতে চায়। গঙ্গার ধারে কোনক্রমে আসিতে পারিলেই যেন প্রতাপের মনোরথ পূর্ণ হইবে।

অবসন্ন দেহমনে প্রতিবাদ আসিল না কেয়ার। ক্লোরোফর্মের নেশা হয়তো সক্রিয়তাকে এমনি অবশ করিয়া তোলে। গঙ্গার ধারে গাড়ী গতিহীন, অনাত্মীয় যুবকের গ্রাসে ক্রিয়াহীন কেয়া।

প্রতাপের হাসি পাইল। উদ্ধতা সুন্দরী কেয়া নয় সত্য, কিন্তু এমন নমনীয় রূপও কেয়ার প্রতাপ দেখিবার আশা করে নাই।

নিজের কান্ত রূপের প্রতি বিশ্বাস ছিল প্রতাপের। কম নারীই তাহাকে প্রতিহত করিয়াছে। আটাশ বছরের জীবনে স্ত্রী ভিন্ন বহু নারীর সহিত প্রতাপ শেঠ মিলিত হইয়াছে। এতদিনে, এত সাধনার পরে শ্রীমতী সোম সদয়া হইলেন বুঝি। এমন বস্তু পূর্বে নাড়াচাড়া করে নাই প্রতাপ। অতএব সাবধানে জল মাপিতে হইবে।

স্বভাবমধুর কণ্ঠে আর একটু মিষ্টত্ব ঢালিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "শরীরটা লাগছে কেমন এখন?" একখানা হাত গাড়ীর গদীর পিছনে অনায়াসে ন্যস্ত হইল কেয়ার কাল এলায়িত কবরীর ছোঁয়ায়।

"কি জানি আজ কয়েকদিন হ'ল শরীরটা ভারি খারাপ হয়েছে। আজ সকাল থেকেই শ্রান্ত লাগছিল, আসাই উচিত হয়নি।"

গঙ্গার উপর একফালি চাঁদের রেখা। গঙ্গার ধারের বাতাস বড় স্নিগ্ধ। বিদেশী বন্দিতা কলিকাতার লাবণ্য আজ সহস্রধারায় উচ্ছ্বসিত। আজ গঙ্গার কূলে কূলে কলিকাতার সমৃদ্ধির চিহ্ন। এই কলিকাতায় কেয়া সোম আগন্তুক মাত্র, কিন্তু মনে-প্রাণে কলিকাতা প্রতাপ শেঠের বণিতা। বণিক শেঠ বাণিজ্যে বন্দরের লক্ষ্মীকে কবলিত করিয়াছে; লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করিয়া আজ সে সরস্বতীকে চায়।

গরমের দিনে দূর সমুদ্রের বাতাস লাগিয়াছে ডিঙি-নৌকার পালে। ইলিশ মাছ ধরার নৌকায় আনন্দ-কলরব।

"মাছ নেবেন, মিস সোম? গঙ্গার ইলিশ?"

স্বপ্নলোকের দৃষ্টি কেয়া মাটিতে ফিরাইল, "মন্দ হ'ত না। চম্পা ভালবাসে। তার দাম কি খুব বেশী?"

"দেখছি। প্রতাপ জলের ধারে নামিয়া গেল। চম্পা নামে কয়েকঘণ্টা পূর্বের দেখা চম্পকবরণীর স্মৃতি মনে উদয় হইল। কেয়া সোম যেন একা-একা, সম্পূর্ণ নয়, যেন রূপসীর রূপে বা বিদুষীর গুণে কোথায় খুঁত আছে। প্রতাপ তাই অতৃপ্ত। কমলদলবাসিনীর সঙ্গে

চম্পকবরণী মিলিলেই প্রতাপের তৃপ্তি। প্রতাপ দুজনকেই চায়। দুইজনই বোধহয় একই সত্তার বিখণ্ড অংশ। সামান্য সময়ের ব্যবধানে একই মাতার গর্ভে সহোদরা জন্মলাভ করিয়াছে।

গাড়ীর ক্যারিয়ার খুলিয়া জেলের সাহায্যে রূপালী মাছের স্তূপ প্রতাপ তুলিল। কলিকাতার নদী কেবল বাণিজ্য-জাহাজ বহন করে না, সে জলের মধ্যে রূপা ফলায়। • কেয়া বিস্মিত হইল— "এত মাছ! কত করে দিতে হ'বে মাছ পিছু?" হাতের রেশমীর বটুয়ার মুখ উন্মোচিত হইল।

"পরে দেবেন। ব্যস্ত কি? একটু নামবেন না এখানে?"

ধীরে ধীরে কেয়ার অবসাদ লুপ্ত হইতেছিল। মাছ, জেলে, নৌকা —বাস্তব বর্তমান। তারা ছায়াচিত্র অতীতকে দূরে ঠেলিয়া দেয়।

জলের ধারে দুইজন দাঁড়াইল।

গঙ্গার প্রাণপা৺ল্ককরা বাতাস, জলের উপর ম্লান জ্যোৎস্না, ইলিশের ডিঙি-নৌকা, সর্বত্র জীবনের গতিবেগ। বর্তমানে চরণ স্থাপিত কেয়ার, অতীতকে ভয় কি তাহার?

প্রতাপকে বিশ্বাসযোগ্য সহসা মনে হইল কেয়ার, "আপনি কলকাতার বিষয় অনেক জানেন দেখলাম।"

"তা জানতে হয় বৈ কি। আমাদের পূর্বপুরুষের অনেক কীর্তি এখানে আছে কি না। এই সব জায়গায় জলা-ডোবা-জঙ্গল ছিল মাত্র। কলকাতা সুন্দরবনের মধ্যে একটা জঙ্গুলে জায়গা ছিল। তাঁতিরা এখানে এসে জঙ্গল কেটে সূতোর হাট বসাল। তাদের 'জঙ্গলকাটা' বলত তাই। কিন্তু, 'কোলকাট্টা' নামে বণিকের কাছে এটি বড় বন্দর বলেই সেকালে বিখ্যাত ছিল।"

"আমার ইচ্ছা করে আপনার কাছ থেকে বা যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছ থেকে পুরনো কথা শুনি। মনে হয়, যা দেখছি তার পেছনে একটা অতীত আছে, তার গল্প আছে। মাঝে মাঝে সেই অতীত আমার কাছে ধরা দেয়।"

এমন অন্তরঙ্গভাবে কেয়া কখনও কথা বলে নাই। বিগলিত প্রতাপ বলিতে লাগিল, "ঠিক বলেছেন। আমারও তাই মনে হয়। যেন আমরা অতীতেরই অংশ। নূতন জন্ম নিলেও পুরনো ছকেই চলব।"

এমন করিয়া কথা বলিলে প্রতাপকে কেয়ার বন্ধু বলিয়া মনে হয়। তাহার হাতে হাঁত রাখিয়া নির্ভর বিশ্বাসে পথ চলা যায়। কেয়া কপোলের পার্শ্বস্থ চূর্ণ অলকগুচ্ছ যথাস্থানে সরাইয়া প্রশ্ন করিল, "কলকাতা, চিৎপুর এক ছিল, না?"

"না। চিৎপুর, কলকাতা, কালিঘাট ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম ছিল।

'কবিকঙ্কন চণ্ডী'তে আছে:

"ত্বরায় বাহিছে তরী তিলেক না রয়,
চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়,
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা,
কালিঘাটে গেল ডিঙা অবসান বেলা"—

এমনি উল্লেখ বহু প্রাচীন বইতে আছে। জব চার্ণক সূতানুটী বন্দরে প্রথমে নেমে গোটা অঞ্চলকে পরে কলকাতা নামে চালান। বাংলার নানা জায়গায় ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির এজেণ্ট জব চার্ণক ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির বাণিজ্য-আগার বা কুঠী স্থাপন করতে চান। নামা জায়গায় চেষ্টা করেও ঠিকমত সফল হননি তিনি। শেষে তিনি সূতানুটী গ্রামে কুঠী আর ইংরেজ উপনিবেশ বসালেন। ধীরে ধীরে ইংরেজদের হাতে কলকাতার নগর জন্ম হ'ল। অবশ্য, তারও আগে আমার পূর্বপুরুষেরা কলকাতার অনেক উন্নতি করেছিলেন। লালবাজারে দোলের দিন আমাদের আবীর রাখা হ'ত, ড্যালহাউসী স্কোয়ারের জলে সেই আবীর গোলা হ'ত, তাই নাম হয়েছে 'লাল দীঘি', 'লাল বাজার'। চলুন না, বাগবাজারের মদন-মোহনকে দেখে আসবেন। কাছেই।"

"মদন-মোহন। কি একটা ছড়া যেন আছে না? শুনেছি কোথায় যেন।" কেয়া প্রতাপের দীর্ঘ বক্তৃতায় বাধা দিল উন্মনাভাবে।

"বাগবাজারের গোকুল মিত্র বিষ্ণুপুরের রাজা দামোদর সিংহের গৃহ-দেবতা মদন-মোহনকে বাঁধা রেখে রাজাকে একলক্ষ টাকা ধার দিয়েছিলেন। এই কাহিনী নিয়ে নানা রকম ছড়া চলিত ছিল। মদন-মোহনের অনুকরণে মূর্তি গড়িয়ে ঘরে প্রতিষ্ঠা করা সেকালে অনেক বনেদী কলকাত্তাইদের ফ্যাশন ছিল। বিষ্ণুপুরের রাজা পরে নকল বিগ্রহ নিয়ে যান কি না। মদন-মোহন খুব জাগ্রত ঠাকুর। দোলের সময় ভারি ঘটা হয়। চলুন না।"

মনোহারিণীর সঙ্গে যতক্ষণ থাকা যায়। কেয়া সোম রাজী হইল। পৌত্তলিক ধর্মে প্রবল আস্থা না থাকিলেও 'মদন-মোহন' নামটি যেন তাহার মনের অবচেতনে গাঁথা আছে। নামের স্পর্শমাত্রে কয়েকটি তার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। ভয় কি? ভয় কি? প্রতাপ শেঠ তোমার বন্ধু। বন্ধুর সঙ্গে দেবদর্শনে চল, কেয়া।

গঙ্গার ধার ছাড়িয়া একটু ভিতরের দিকে অগ্রসর হইলে দেউড়ী পাওয়া গেল। সম্মুখে পুতুল, ছবি এবং নানা তৈজসপত্রের দোকান। বাঁধা যাত্রীদলের চিহ্ন।

দেউড়ী পার হইয়া চকমিলানো নাটমন্দির। তাহার প্রান্তে প্রস্তুত ঠাকুরদালানের ভিত্তি ও সোপান। সাগ্রহে কেয়া অগ্রসর হইল।

সিংহাসনে বিগ্রহ—পাথরের সহিত অষ্ট-ধাতুর সমন্বয়ে ললিত-মধুর বংশীধারীর মূর্তি। পাথরে কি এতও লাবণ্য থাকে। মুগ্ধা কেয়া দেখিতে লাগিল। পাশে ক্ষুদ্রকায়া রাধা। দুই মূর্তির পাশাপাশি সখী-মূর্তি।

কেয়া কখনও কোন বিগ্রহের প্রতি ভক্তিভাব অনুভব করে নাই। আজও মনে শুধু সৌন্দর্যপূজারীর উচ্ছ্বাস অনুভব করিল মাত্র। সবিস্ময়ে কৃষ্ণমূর্তির আকর্ণ স্বর্ণচক্ষুর কষ্টিপাথরের তারকা দেখিতে

লাগিল সে। সিংহাসনের সমুখে প্রণত ভক্তের দলের উদ্দেশে কখনও কি সেই নেত্র স্নেহ বর্ষণ করে? বঙ্কিম অধরে মোহন করাঙ্গুলিধরা স্বুবর্ণ বংশী। সহস্র বৎসরের সাধনায়ও বাঁশীর স্বরের আহ্বান কেউ শুনিতে সমর্থ হয় নাই। তবে, কেন পাথরে প্রাণ দিয়া মূর্খের দল মরিতেছে? কেন পুতুলের এত সম্পদ, যখন পথে পথে নিঃস্ব-সর্বহারার দল? কেন রজত-কাঞ্চনে দেব-দেউলের সৃষ্টি, যখন রোগীর জন্য হাসপাতালে স্থানাভাব?

প্রতাপ একখানা পাঁচ টাকার নোট প্রণামী ফেলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল। মদন-মোহন, তুমি বৃন্দাবনে অবৈধ প্রেমের বন্যা বহাইয়াছিলে, তুমিই প্রতাপের সহায় হও।

কেয়া যেন আবার কাঁপিয়া উঠিল। আশ্চর্য, মেয়েটার মৃগী রোগ ধরিল না কি?

মদন-মোহনের দীর্ঘায়ত চক্ষে সতর্ক দৃষ্টি, যেন বিগ্রহ মূর্তি বিদ্রূপের হাসিতে ভাস্বর হইয়া উঠিলেন। কেয়া সোম, তোমার পলায়নের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রথমেই কেন পলায়ন কর নাই, কেন সেই বাড়ীতে গেলে, বল? এখন অতীত প্রাচীরের মত তোমাকে বেষ্টন করিয়াছে। অতীতের হাত হইতে আর উদ্ধার নাই তোমার।

"এখানে আনলেন কেন?" সজাগ হইয়া কেয়া সন্দেহের দৃষ্টি মেলিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল। যেন সহসা পার্শ্বে কোন অশুভ উপস্থিতি তাহাকে সজাগ করিল। কিন্তু, প্রতাপের সুন্দর, সহাস্য আকৃতিতে কোথাও অশুভতা নাই। প্রতাপকে সহসা সন্দেহ কেন?

প্রতাপ বিস্মিত। কেয়া সোম যেন একটু ঢং করিতেছে। কথা-বার্তায় স্পষ্ট অসংলগ্নতা তাহার। সে উত্তর দিল, "কাছেই এসেছিলাম, তাই নিয়ে এলাম।"

"রাত হয়ে যাচ্ছে। চলুন ফেরা যাক।" কেয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। প্রতাপ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "প্রণাম করবেন না?"

"না।"

আর কথা না বাড়াইয়া, ধর্মাচরণে আধুনিকার আপত্তি ভাবিয়া প্রতাপ গাড়ীতে ফিরিল। গঙ্গার ধারে ধারে এবার ফেরার পালা।

গ্রীষ্মের ঠাণ্ডা বাতাস জলজ, সুখকর। চাঁদের ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় গঙ্গার জল উজ্জ্বল। চলার পথ উজ্জ্বল। নিঃশব্দে দ্রুতগামী গাড়ী চলিতে লাগিল।

"এইখানে সুতানুটী ছিল—জব চার্ণকের স্বপ্ন।" প্রতাপ অতীত কাহিনী উদ্ধারে বিমুখী মনকে প্রীত করিতে প্রয়াস পাইল, "ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন তিনি সফল করেছিলেন সত্য, কিন্তু, নিজে শেষ বারের পর তিন বছরের বেশী আর বাঁচেন নি। সেন্ট্ জন গির্জার উঠোনে তাঁর সমাধি আছে। ওঁর জামাই আয়ার একটা স্মৃতিচিহ্ন করে দিয়েছেন।"

কেয়া নীরবে শুনিল। হিন্দু বণিক তখন সাগরে বাণিজ্য করিতে যাইত—যাভা, সুমাত্রা, বালি। সিন্ধুতীরে চন্দন দারুচিনি বনের ছায়ায় অর্ণবযানগতির লক্ষ্য ছিল। সাগরমজ্জিতা সিংহল দ্বীপ সওদাগরকে ডাকিত। ভাগীরথীর স্রোতধারায় সমুদ্রকল্লোল জাগিত—বঙ্গোপসাগরের কল্লোল। দেশ-দেশান্তর অনায়াসে গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির জলধারায় ভাসিয়া আসিত, আবার সেই জল কতদূরে বাঙালীকে ডাকিয়া লইত!

ভোগের জন্য, সমৃদ্ধি কামনা করিয়া বিদেশী 'কালীকোটায়' আসিয়াছে। রক্তপাত, পাপ, অন্যায় দখল—অনেক কিছু তারা করিয়াছে। কিন্তু, ভোগ-সামর্থ্য কতটুকু? বনভূমির মধ্যে সমাধিস্থান ছিল, সেখানে কাঁচা মাটির বুকে একটি দুইটি সাদা ফুল ঝরিয়া পড়িত। জব চার্ণকের কলিকাতা প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে বিদেশী ইংরাজের সমাধি হইত এখানে। হুগলীর পথে, বালেশ্বরের পথে, জাহাজে-মৃত বিদেশীর গোরস্থান ওখানে ছিল। পাশে সেন্ট জন গির্জা নির্বান্ধব মৃতগুলির উপর প্রহরা দিত। সেখানেই জব চার্ণকের সাম্রাজ্যলোভ সমাধিস্থ হইল।

শির্‌শিরে হাওয়ায় পাতায় পাতায় শির্‌শিরানি। হাল্কা বাতাসে জলের ঢেউ। চিরনিদ্রামগ্ন জব চার্ণকের দুরাশা কি রাত্রির যামে গতি লাভ করে? কালো ঘোড়ার পিঠে মৃত জব চার্ণক কি সারা কলিকাতার সুপ্তির বুকে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়? লোভের দৃষ্টি মেলিয়া, তৃপ্তির দৃষ্টি মেলিয়া নগরীবারাঙ্গনার রূপ দেখে। বিদেশীর লোভের, বিদেশীর ভোগবাসনার মূর্ত প্রতীক জব চার্ণক। আজ রাত্রে বার বার জব চার্ণক কেয়া সোমের মনে ফিরিয়া আসিতেছে। কলিকাতার মাটিতে বিদেশী লোভের বীজকে হলকর্ষণে সহস্র শাখায় ফলাইয়া তুলিয়াছে মৃত চার্ণকের আত্মা। অশুচি প্রহরে নগরের শত আত্মাকে চার্ণক উদ্দীপিত করিয়া তোলে। তাহারাও সাম্রাজ্য স্থাপনা করিতে চায়—ভোগের সাম্রাজ্য।

কাল ঘোড়ায় ভ্রমণশীল ঘোড়সওয়ার অবশেষে কেয়ার পার্শ্ববর্তীর কায়ায় মিশিয়া গেল। কিন্তু, প্রতাপ তো বিদেশী নয়? তবে কি সে বিদেশী লোভের পরিপূরক? যুগে যুগে প্রতাপের দল এমনি করিয়া বিদেশীর হাতে বাংলার মেয়েকে তুলিয়া দিয়াছে। প্রথমে সে অন্যকে দিয়াছে, তারপরে সে নিজে ভোগ করিতে চাহিয়াছে। সভ্যতার স্পর্শে কিঞ্চিৎ উন্নীত হইয়া বর্তমানে বন্ধু সাজিলেও তাহার ইচ্ছা ওই—সুবিধায় বা উপভোগে ব্যবহার করা। নিস্তব্ধ রাত্রির হাওয়ায় কেয়ার চোখে দুইবিন্দু অশ্রু জমিল।

প্রতাপ লক্ষ্য করিল। গাড়ীর স্টীয়ারিংএ করগ্রাস তাহার দৃঢ় হইল একটু, চোয়ালে কাঠিন্য জাগিল। কেয়ার চোখের জল কেন তাহার মনে আনন্দ আনে? পৈশাচিক উল্লাস বয় শোণিতস্রোতে। কুমারীর কমতনু যদি বা তাহার অভিজ্ঞ আলিঙ্গনে ধরা দেয় তাহা হইলেও তাহার তৃপ্তি আসিবে কি? ফুলের মত কোমল দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেও পৌরুষ লালসার তৃপ্তি মিলিবে না। নিপীড়নের সীমা আছে। প্রতাপের যৌন নিষ্ঠুরতা অনেক বেশী চায়। কেয়া সোমকে সম্পূর্ণ রিক্ত করিয়া, লাঞ্ছিত করিয়া হয়তো তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি।

গাড়ী কেয়ার দরজায় থামিল। প্রতাপ যথারীতি গাড়ীর দরজা খুলিয়া কেয়াকে অবতরণে সাহায্য করিল। তারপরে বিনীত কণ্ঠে বলিল, "একটা চাকর—মাছগুলো।"

"হ্যাঁ, ডাকছি"—চৌকাঠ পার হইতে চম্পার উৎসুক চোখে কেয়ার দৃষ্টি মিলিল, "এই চম্পা, ফ্যালাকে ডেকে আন। গঙ্গার ইলিশ এসেছে।"

"কি মজা! কি মজা!" চম্পা বেণী দোলাইয়া ফ্যালাকে ডাকিয়া দ্বারে উপস্থিত হইল। সেই রূপকুমার আবার আসিয়াছে।

প্রতাপের মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল চম্পকবরণীকে দেখিয়া। সবলাদীপ্তা চম্পাকেও সে চায়। ক্যারিয়ার খুলিয়া ধরিল সে, "দেখুন।"

"ওমা, এত মাছ! কে খাবে?"

"আপনারা খাবেন, আমরা খাব।"

ফ্যালা চটের থলে হাতে উপস্থিত, সঙ্গে কেয়া।

"দিন একটা তুলে।"

কর্ণপাত না করিয়া প্রতাপ চারিটি ইলিশ নিজহাতে তুলিয়া থলের মধ্যে ফেলিল।

"একি, এতগুলো কেন? আমাদের খাবার লোক নেই।"

"খুব আছে। একটা আপনি, একটা আপনার বোন, একটা আপনার দাদা, আর একটা মা বাবা।"

কেয়া বিপন্ন হইল। এতগুলি ইলিশের মূল্য দিলে হাতে কিছুই থাকিবে না। ধনীপুত্রের সহিত বন্ধুত্বের ফল! রেশমের বটুয়া খুলিয়া ক্ষীণস্বরে কেয়া বলিল, "দাম কত হ'ল?

"দাম? মিস্ সোম, আমি না হয় বিদ্যাবুদ্ধিতে আপনার চেয়ে ছোট, তাই বলে আমাকে কি অপমান করবেন? বন্ধুকে মাছ খেতে দিয়ে দাম নেয় কেউ!"

কেয়ার মুখ লাল হইয়া উঠিল, "এরকম কথা তো ছিল না।"

"কথা কিছুই ছিল না। আপনি তো নিজে নিতে চান নি, আমিই বললাম। গঙ্গার ধারে গেলে ইলিশ কিনে আনি আমি। আজ না হয় আপনাদের জন্য দু'টো দিলাম। সামান্য দাম। দিয়ে বা নিয়ে লাভ লোকসান নেই।"

চম্পা সরল হাস্যে নিরুত্তর দিদিকে বলিল, "যাক, আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি। আপনি হাতটা ধুয়ে নিন, ঘরে আসুন।"

প্রতাপ ঘরে বসিল অতি সহজ ভাবে।

"একটু চা চলবে কি ?"

চম্পার প্রশ্নে সে হাসিয়া উত্তর দিল, "নিশ্চয়। এই সময়ে আমি এক কাপ চা খাই রোজ।"

"দিদি, একটু বোস এখানে। আমি চায়ের কথা বলে আসি। আর, মাছ ভাজা খেতে হবে কিন্তু চায়ের সঙ্গে।"

"সে কি, আমি খেয়ে নিলে আপনারা খাবেন কি ?"

"যথেষ্ট আছে। আমি অবশ্য গোটা একটা খাব। কিন্তু, দিদির যা খাওয়ার বহর ! বসুন, এলাম বলে।"

অপস্থতমানা চম্পাকে ডাকিয়া কেয়ার বলিতে ইচ্ছা হইল ঃ প্রতাপকে ঘরে ডাকা উচিত নয়। প্রতাপের সঙ্গে চম্পার মেশা উচিত নয়। প্রতাপের মধ্যে ভয়ের কারণ আছে।

কিন্তু, কিসের ভয় ? ভয় কেন ? ভয় ! না, না। ভয় নাই। ভয় থাকিতে পারে না।

কেয়া সোমের রচনা

"রাত অনেক হয়েছে। ইলিশমাছের উৎসব মিটে গেছে। এখন টেবলে আলো জ্বালিয়ে লিখতে বসেছি। লেখা আমার পেশা, খেয়াল নয়। অতএব নিয়মিত কেরানীর অফিসের তাগিদ তার।

কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে ইলেকট্রিক আলো ভারি প্রখর। কোন কোন নায়িকার সুলভ ইচ্ছা উদয় হয় মনে—একটি সাদা

মোমবাতি জ্বালিয়ে ঠাণ্ডা আলোয় লিখতে বসি। আমি গান লিখি, কবিতা লিখি, প্রবন্ধ লিখতে হয় আমাকে। আজ ইচ্ছা করছে একটা গল্প লিখি, একখানা উপন্যাস।

কথা-সাহিত্যিকদের গল্পের পেছনে ছুটে হয়রান হতে দেখেছি। কিন্তু, গল্প তো ছড়ানো থাকে। পুরাতন পৃথিবীর ধূলায় গল্পের গুঁড়ো ওড়ে। পথে চলতে চারপাশ থেকে গল্পের হানা। এখন আমাকে নিয়ে গল্পের উল্লাস চলছে, বুঝতে পারছি। কিন্তু, ঠিক মিলিয়ে একটা গোটা গল্প গেঁথে তোলা আমার ক্ষমতা নেই।

মদনমোহনকে কেন প্রণাম করলাম না? আমি ঠাকুর-দেবতা না মানলেও প্রথামত জোড়করের প্রণাম-জ্ঞাপনে অভ্যস্ত। আমার সেই বিগ্রহটিকে দেখামাত্র বুকের মধ্যে কেঁপে উঠেছিল, আনন্দে নয় ভয়ে। মনে হয়েছিল যেন কতবার দেখেছি। কতবার আমাকে ওঁর সামনে অবলুণ্ঠিত হতে হয়েছিল, আমাকে ওঁর সেবা করতে হয়েছে। তবু উনি প্রসন্ন হননি। উনি আমার সর্বনাশ করেছেন। ওঁকে কেন প্রণাম করি? উনি দেবতা নন, পুতুল মাত্র।

পুতুলই নিশ্চয়। রামমোহন রায়ের ধর্মমত আমাকে আবিষ্ট করে। বৈদান্তিক একেশ্বরবাদে আমি বিশ্বাসী। পুরনো বাংলায় লেখা রামমোহনের পুঁথি আমি পড়েছি। হিন্দুর মেয়ে হ'লেও মনেপ্রাণে আমি রামমোহনের শিষ্যা। কারণ, শুধু তাঁর প্রচারিত উদার মহৎ ধর্মসংশোধনী প্রস্তাব নয়, তাঁর মানবতার বিকাশ। সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহনের সংগ্রামের জন্য আমি তাঁকে সকলের চেয়ে শ্রদ্ধা করি।

কি ভয়ানক প্রথা! জীবন্তে মৃতের চিতায় নিজেকে দগ্ধ করা। আবার শুনেছি অনেক নারী 'সতী' হ'বার জন্য ব্যাকুল হয়ে স্বেচ্ছায় আত্ম-বিসর্জন করতেন। সেও তো গুরু-পুরোহিতের ভ্রান্ত ধর্ম-শিক্ষার ফল, জনতার করতালির লোভ। স্বীকার

করছি তীব্র বিরহও একটি কারণ। কিন্তু বিরহের তীব্রতা কালে হ্রাস হয়। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে 'সতীদাহ' আত্মহত্যারি নামান্তর।

হিন্দুনারী কি যুগে যুগে অত্যাচার সহ্য করবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে। জীবন্তে দগ্ধ হওয়া থেকে কেউ তাকে নিবৃত্ত করত না, বরঞ্চ চিতার দিকে এগিয়ে দিত। রামমোহন সতীদাহ নিবারক প্রধান হোতা ছিলেন।

আচ্ছা, কেমন করে তারা সহ্য করত—সেই সেকালের সতীরা? অজস্র জনসমাগমের মধ্যে বিবাহ সাজে স্বামীর চিতায় উঠেছে। জ্বলন্ত আগুন ধীরে ধীরে তাকে দগ্ধ করছে। উঃ! আমি যেন এখানে বসে সেই দহন অনুভব করছি। শতাব্দীর পারে আমারি দেহ যেন অন্ধকুসংস্কারের বলি হয়েছিল।

রামমোহনের আগে একজন 'সতীদাহ' নিবারণ করেন—তিনি কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা। আমি বইতে পড়েছি জব চার্ণক ১৬৭৮। ৭৯ সালে পরমা সুন্দরী হিন্দু বিধবাকে সতীদাহ থেকে জোর করে নিবৃত্ত করেন। তারপরে বিধবাটিকে জব চার্ণক বিবাহ করেন। তাঁদের সন্তানাদি হয়েছিল।

বিদেশীর চোখে বাংলার বধূর রূপ ধরা পড়েছিল। স্বামীর শব অনুগমন করছেন সুন্দরী অপরূপ বেশভূষায়। ভোগের স্পৃহা সাহেবের বুকে জাগল। নীল-নয়না, তুহিনশুভ্রা সাগরিকার রূপ ভুলে গেলেন তিনি। লোভের হাত বাড়ালেন বাংলার বধূর দিকে।

জব চার্ণকের আত্মা এখনও কলিকাতার পথে ঘুরে বেড়ায়। সূতানুটীতে আজ গিয়েছিলাম। জব চার্ণকের মনের মত দেশ। হুগলি ত্যাগ করে এখানে আশ্রয় নেন তিনি। তাঁর প্রিয় ভূমি। মনে হ'ল সেখানে এক ছায়া অশ্বারোহী বিচরণ করছে—সেন্ট-জন্-ক্যাথিড্রেলের মাটির নীচে সমাধি তারই হিন্দু প্রিয়ার। শোকার্ত চার্ণক সেখানে প্রতি বছর একটি করে মোরগ বলি দিতেন

পত্নীর মৃত্যু-তিথিতে। নিজের মৃত্যুর পরে পাশেই তিনি সমাধিস্থ হন। তাহ'লে, আগ্রার নির্মিত স্মৃতিসৌধটি তাজমহল! লোভের পাশে প্রেমও ছিল কি একটু?

আজ মনে হল মৃত চার্ণক পুনরুত্থিত হয়েছেন—তাঁর প্রিয় ভাগীরথীর তীরে তীরে বিদেশীর দুরাকাঙ্ক্ষার বাতাস আবার ছড়িয়ে যাচ্ছেন। যুগে যুগে সম্পদ, রমণীলাবণ্য এমনি করে বিদেশীকে বাংলার মাটির বুকে ডেকে এনেছে। ঔপনিবেশিক মন নিয়ে এসেছে তারা।

প্রতাপ শেঠ মূর্খ, কিন্তু প্রাচীন কলিকাতার গুপ্তরহস্য সে জানে। সে-ও বিদেশীর বন্ধু, সে-ও লোভী। তাই আজ রাত্রে একমুহূর্তের জন্যও মনে হ'ল চার্ণকের সত্তা ওরি মধ্যে প্রবুদ্ধ হয়ে উঠল। চার্ণক সমাধিতে মোরগ বলি দিতেন কেন? ওঝা ভূতের উদ্দেশে মোরগ বলি দেয়, অনার্য-জাতি দেবতার উদ্দেশে মোরগ বলি দেয়! আর্য বংশের গাঙ্গেয় ভূমিতে খৃস্টান চার্ণক অপদেবতার পূজা করছেন। সূতানুটির, সুন্দরবনের জঙ্গলের অসভ্যসুলভ সংস্কার জন্মেছিল তাঁর। তিনি অপদেবতা হয়ে কলিকাতার গঙ্গাধারে বিচরণ করছেন। আবার বিদেশীকে ডাকছেন তিনি—বঙ্গোপসাগরের কূল থেকে, দূর সব মহাদেশ থেকে ডাকছেন তিনি। নূতন উপনিবেশ সৃষ্টি করতে চান তিনি। লোভীর বুকে কামনা তিনি জ্বালিয়ে রাখেন অহরহ। বিদেশীর দৃষ্টি থেকে বাংলা মায়ের পরিত্রাণ নেই।

জব চার্ণকের হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ আর চীনে আড্ডায় কোন বনেদী বাড়ীর বৌ—স্বপ্নে দেখছি যেন। এদের যোগসূত্র আছে না কি? কি মাথামুণ্ড ভাবি দিনরাত? আবার রাত্রিবেলা কাল কি রকম স্বপ্ন দেখলাম? ভুলে গেছি। আবছা মনে পড়ে চিৎপুরের রাস্তা, মদনমোহন, ডাকাতি, চীনগামী জাহাজে সাহেব। একটা অভিনব গল্প আমারি চারপাশে গাঁথা হচ্ছে, বুঝতে পারি।

গল্পের ছকে চম্পা পর্যন্ত জড়িত। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি কি কখনও রহস্যের সন্ধান পাবে?

চীনেদের দেখলে কেন জানি না আমার ভয় করে। চিরকাল। ফিল্ম কম্পানি বাড়ীভাড়া করেছেন চীনে-পাড়ায়। চার পাশে চীনে। কেন যে যখনি দেখি অস্বস্তি বোধ করি। বাড়ীর মধ্যে যেন কার দিনপঞ্জীর পাতা ওড়ে, বাইরে চীনে-পাড়ায় গলির মধ্যে বিভীষিকা জমে।

অথচ, চীনের নামে ভয়-অস্বস্তি কেন আমার? তারা কি কেবল দর্জি, মুচি অথবা নেশাখোর গুণ্ডা? যে দেশের ধর্মগুরু কন্‌ফিউশিয়াস ছিলেন, সে দেশের নীতিশিক্ষা নিশ্চয় চরম অধঃপতন থেকে তাদের রক্ষা করবে। আমি কন্‌ফিউশিয়াসের ধর্ম উপদেশ স্মরণ করব। তাহ'লে চীনেদের ভয় করবো না।

কন্‌ফিউশিয়াস প্রেমের, নীতির শিক্ষা দিয়েছেন। দয়া, ক্ষমা, অনুতাপ মহৎ—শুধু কথায় নয়, কাজে গ্রহণ করতে হয়।

প্রতাপ শেঠের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য সম্পর্কটা শুধু জানে। কিন্তু, ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম যে চীনে বিরাট চেতনার উন্মেষ করেছিল, সে স্মরণীয় ঘটনার তাৎপর্য ওর বোধগম্য নয়। ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম অষ্টম শতাব্দী থেকে চীনের নবজন্ম বা Chinese Renaissance-এর সূচনা করে। ভারতবর্ষকে জানলে চীনকে জানা সম্ভব। কিন্তু, তখনও চীন বৈদেশিক শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইত না। চীনের প্রাচীর ও কন্‌ফিউশিয়াসকে চরম জানা মনে করত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে জাপানীর কাছে পরাজয় তাদের আত্মাভিমান প্রথম ভেঙে দিল। নব্য চীন 'বক্সার-অভিযানের' উদ্যমের মধ্যে জাগ্রত হ'ল। এই গৌরবময় চীন দেশকে আমি ভয় করি কেন?

চোখে ঘুম নেমে আসছে—ঘুমের দেশ প্লাবিত করে দিয়েছে হোয়াংহো নদীর পীতজলের প্রবল ঘোলা স্রোত।"

প্রতাপ শেঠ বাড়ীর হাতার মধ্যে গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিবার মুখে প্রকাণ্ড হলঘরে পিতার গদি। পালিশ-চিক্কন সেগুনের খাপে পুরু গদি সাদা চাদরে ঢাকা। এখানে ওখানে তাকিয়া। মনোহর শেঠ একটা হাত-বাক্স সম্মুখে লইয়া বসিয়া আছেন। ডান হাতের কাছে টেলিফোন, বাঁ হাতের কাছে তাম্বুলের রৌপ্য আধার। সামনে খাসমুন্সী খাতাপত্র হাতে আয়কর ফাঁকি দিবার পথ নির্মাণে ব্যস্ত।

পুত্রের পদধ্বনি শুনিয়া শেঠজী একবার তাহার দিকে চাহিয়া সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল ঘড়ির দিকে দৃষ্টি ফেলিলেন। আজ শ্রীমান সত্বর ফিরিয়াছে, দেখা যায়।

প্রতাপ দোতলায় নিজের ঘরে চলিয়া গেল। পাশেই একখানা বসিবার ঘর—একদিকে গদি অন্যদিকে সোফা-সেটি। গদির উপর পা গুটাইয়া নীরু বসিয়াছে। নীচে গালিচায় পিত্রালয়ের দাসী। নীরু নদীয়া জেলার মেয়ে। সৌন্দর্য ও অর্থের জোরে বনেদী কলকাতায় নীতা হইয়াছে। পছন্দ তাহার পাড়াগেঁয়ে এখনও। শ্বশুরবাড়ীর, অর্ধ মাড়োয়ারী অর্ধ বনেদী পরিবেশে হাঁফ ধরিয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে বাপের বাড়ীর দাসীটি অবলম্বন।

প্রতাপকে দেখামাত্র দাসী মাথায় কাপড় টানিয়া জিভ কাটিল। এখানে সেমিজধারিণী তাহাকে হইতে হইয়াছে। জামাইবাবু ঘরে আসিয়াছেন, আর দিদিমণির সঙ্গে গল্পের জন্য বসিয়া থাকিতে হইবে না। চাকর-চাকরাণী মহলে ফিরিয়া সেমিজ-মোচনে বাঁচিবে সে।

প্রতাপ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নীরুকে দেখিল। গালে পানের ঢিবি। হাতে, গলায়, কানে কট্‌কটে লাল মীনাকরা গোছা গোছা সোনার গয়না। গদি জাঁকাইয়া বসিয়া আছে যেন মাড়োয়ারী বৌ। এইমাত্র যে দুই শোভনাঙ্গীকে দেখিয়া আসিল, তাহারা আর নীরু যেন এক জগতের জীব নয়।

মাতার ঘরে কয়েকটি মহিলা বসিয়া সিদ্ধির শরবত সেবন করিতেছেন। প্রচুর বাদাম-পেস্তা-চর্চিত সামান্য সিদ্ধিমিশ্রিত দুগ্ধ। মধ্যে গদির উপর থালায় মেওয়া।

মহাজনের প্রসাদনে মনোহর শেঠ গোটা বাড়ীর আবহাওয়া মাড়োয়ারীসুলভ করিয়াছেন। একবার বিরক্ত হইয়া প্রতাপ আবার ভাবিল, ব্যবসায়ের খাতিরে অন্যায় কি? লক্ষ্মীর পথ নানাদিকে খুলিতে হয়।

টানা বারান্দার ধারে বাথরুম, নীচে একতলার বাগান। এক অংশে চাকরদের বাড়ী। প্রতাপ হাতমুখ ধুইতে যাইয়া চাকর-দাসী মহলে গোলমালে আকৃষ্ট হইল। নীরুও বারান্দায় আসিয়াছে।

"ওখানে কি হচ্ছে?"

নীরু সকৌতুকে উত্তর দিল, "দাসু-বামুনের অসুখ করেছে। তাই ওর দাদা ওঝা এনে ঝাড়াচ্ছে।"

"ওঝা? এখন আবার কেউ ওঝা ডাকে নাকি?"

"ওরা যে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের লোক। ওদের গাঁয়ে খুব ওঝার চলন।"

প্রতাপ অত্যন্ত বিরক্ত হইল। তাহার বাড়ীর চাকর-দাসী ওঝা ডাকে, প্রকাশ পাইলে মুখ দেখানো ভার হইবে? কেয়া সোম কি ভাবিবে? চম্পা সোম?

নিজস্ব বেয়ারাকে ডাকিয়া সে হুকুম দিল, "যা, বল গিয়ে বড় সাহেব এ সব কাণ্ড বন্ধ করতে বললেন। ডাক্তার দিয়ে দেখাক। যা লাগে আমি দেব।"

ঘড়িতে নয়টা পঁচিশ মাত্র। নয়টার সময় সুখ-স্বর্গ হইতে উঠিয়া সুখহীন গৃহে সে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে। দশটার পূর্বে নৈশভোজন চলে না। ইলিশমাছ ভাজার বিলুপ্তি এখনও পাকস্থলীতে হয় নাই। বাড়তি সময়টা কি করা যায়?

নীরু বলিল, "অনেক গঙ্গার ইলিশ আপনি এনেছেন শুনলাম।

গঙ্গার ধারে গিয়েছিলেন বুঝি ?" স্বামীকে 'আপনি' বলা শেঠবাড়ীর রীতি।

"হ্যাঁ।" নীরুর সঙ্গে আর কি কথা বলা চলে? তার চাইতে ঠাকুরদা তেজচন্দ্র শেঠের ঘরে একটু বসা যাক। কেয়া কতকগুলি প্রাচীন কলিকাতা সম্পর্কীয় বই চাহিয়াছে। চম্পাও অতিশয় উৎসুকা। দুই বোনকে প্রাচীন কলিকাতার ভূতে ধরিয়াছে। ঠাকুরদাদার কাছে পুঁথির সন্ধান মিলিবে। তাছাড়া, ঠাকুরদাদাকে রাখাই উচিত। ঠাকুরদাদার লাখেরাজ সম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী সে।

বৃদ্ধের বয়স প্রায় শতাব্দীর কোঠায়। নয়ের অঙ্কে চলিতেছে। তাঁহার ঘরখানির পাশে খোলা ছাদ। সেখানে অসংখ্য গোলাপ ফুলের টব। তেজচন্দ্র শেঠের উদ্যানরচনায় প্রীতি ছিল। বর্তমানে বাগানে নামিবার বয়স নাই। ছাদের উপর সকল প্রকার বৃক্ষস্থাপনা চলে না। তাই তিনি প্রিয়তম গোলাপের আরাধনা করিয়াছেন। টব-বাক্সের বাগানে সকাল বেলা মালী আসিয়া তেজচন্দ্রের নির্দেশমত বৃক্ষসেবা করে। রাশিয়ান রোজ, ব্ল্যাক প্রিন্স্ প্রভৃতির শোভা ওখানে।

তেজচন্দ্রের ঘরে গদি নাই—ফরাস। শুভ্র তাকিয়া হেলান দিয়া ইলেকট্রিক দেয়ালগিরির আলোয় তেজচন্দ্র আলবোলার নল মুখে শায়িত। মেজের কার্পেটের উপর হরিণের চামড়ার চটীজোড়া খোলা। রাত্রির আহার শেষ হইয়াছে। ভৃত্য তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে।

নাতিকে দেখিয়া তেজচন্দ্র প্রীত হইলেন। নিঃসঙ্গ-বিপত্নীক জীবনে সময় কাটানো শক্ত। তাছাড়া, প্রতাপ তাঁহার প্রিয়।

"এস ভাই, আজ বাড়ী তাড়াতাড়ি ফিরেছ, না?" তেজচন্দ্র তাম্রকুটের নেশা ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিলেন।

"দেখুন তো কাণ্ড!" প্রতাপ ওঝার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল।

"আমাদের সময়ে কিন্তু ভাই, সর্বদা ওঝা ডাকা হ'ত। মেয়েদের

আর বাচ্চাদের বেশীর ভাগ ভূতে ধরত কিনা। সে বড় মজার ব্যাপার। সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে ঘরের দোরে ওঝা বসত। তারপর গোপনে মাটির ঘরে মেজের চারিদিকে লোহার শলা পুঁতে কাপড়টা টাঙিয়ে দিত। লোকে ভাবত ওঝা বসে আছে। ওঝা কিন্তু এধারে চালের বাতায় দড়ি দিয়ে উঠে ভূত সাজত। গলার স্বর বদলে কথা বলত, নানা রকম শব্দ করত। আবার ওঝা সেজে কাপড়ের আড়াল থেকে স্বাভাবিক স্বরে কথা বলত। বাইরে ওঝার লোক লুকিয়ে থাকত। কখনও তারা গাছের ডাল ভেঙে ফেলত, কখনও থান-ইট ফেলত। ভূত বিদায় হচ্ছে ভেবে সকলে তটস্থ।"

প্রতাপ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপনি তো সমস্ত জানেন। তবে সকলকে বাধা দিতেন না কেন ওঝা ডাকতে ?"

"আরে ভাই, কত বাধা দেব ? ঘড়ি-ঘড়ি তখন ডাইন, ব্রহ্মদৈত্য, শাঁকিনীর আবির্ভাব হ'ত ! পাড়াগাঁয়ে তো কথাই নেই। জ্বর-বিকার বা বায়ুরোগ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে ওঝা এসে বসত। আমরা ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে কুসংস্কার বলে বুড়োদের সঙ্গে শুধু তর্ক করে যেতাম। ফল হ'ত না।"

"ইংরেজিনবীশ বলে সকলে ঠাট্টা করত বুঝি ?"

"ইংরেজিনবীশ হ'তে পারলাম কই ? ছেলেবেলায় ঠাকুরদা পার্শি পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওঁদের সময়ে জেলার রাজকাজে পার্শি ব্যবহার হ'ত কিনা। তাই ছেলেবেলা থেকে ওঁদের পারস্যভাষায় রপ্ত হ'তে হ'ত। হিন্দুস্থানী লালার কাছে সেখ সাদীর 'পন্দনামা' মুখস্থ করতে করতে প্রাণ যেত। তারপর বাবা ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা করলেন। কলকাতায় ইংরেজি চলত। তোমার বাবাকে আমি অল্প-বয়সে হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। আমাদের সময়ে হিন্দু-কলেজ, হেয়ার স্কুলে সবাই পড়ত, কিন্তু ঠাকুরদার জেদে আমাদেরকে বাড়ীতে পড়াশোনা করতে হ'ত। ষোল বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়ে গেল। আর স্কুলে ভর্তি হওয়া গেল না। সেই সময়ে অনেক

৬

পড়ুয়া ছেলে ব্রাহ্ম বা খৃস্টান হচ্ছিল। তাই ঠাকুরদা ভয় পেতেন।"

"কিন্তু তিনি তো ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির এজেন্ট ছিলেন। শুনেছি যে সাহেবরা তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ করতেন। তবে ইংরেজি শেখায় আগ্রহ ছিল না কেন?"

তেজচন্দ্রের ললাটে ছায়া পড়িল। বংশানুক্রমে তিনি তান্ত্রিক; উচ্চ গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মা জগদম্বে! মা, মা!" প্রতাপ স্থির সন্ধানী দৃষ্টি মেলিয়া ঠাকুরদাদার দিকে চাহিয়া রহিল। অসমাপ্ত কাহিনীর শেষ অধ্যায় আজ সে শুনিবেই।

ইংরেজ, পর্তুগীজ, ইটালী দেশীয় লোক বৈদেশিক ডাকাতদলে যুক্ত থাকিত। দেশীয় বহু ধনী ডাকাতের সর্দার ছিলেন। তেজচন্দ্রের পূর্ব পুরুষ এইরূপ একটি ডাকাতদলের সর্দার ছিলেন বলিয়া কথিত আছে! চিৎপুরের পথে 'ডাকাতে কালী' চিত্তেশ্বরীর মন্দিরে ঘোর তান্ত্রিক ডাকাতদলের সর্দার শেঠজী নরবলি পর্যন্ত দিয়াছেন। মন্দিরের নিকটে ডাকতাদের আড্ডা ছিল—গুপ্ত সর্দার শেঠজী। এখানে সতীদাহের অগ্নি উনবিংশ শতাব্দীর বুকেও প্রজ্বলিত ছিল। আশেপাশের বাড়ী হইতে সন্ধ্যার পরে প্রাতঃকাল পর্যন্ত বন্দুকের শব্দ করিতে হইত ডাকাতদের ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে।

চিৎপুরের প্রাচীন রাস্তাটি ধরিয়া বৈঠকখানা অঞ্চলের কোন বনেদি পরিবারের নববধূ ও বর মদনমোহনের আরতি দেখিতে দূর অতীতের কোন দিনে, হয়তো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে, যাইতেছিল। সেই বাড়ীর কুলদেবতা মদনমোহন। নিয়ম ছিল বিবাহের অষ্টাহমধ্যে বর-বধূকে আদি মদনমোহনের আরতি দেখাইতে হইবে। নববরের পিতা শেঠজীর শত্রু। সম্প্রতি মোকদ্দমায় শেঠজীকে পরাজিত করিয়াছেন। আগাগোড়া শেঠ পরিবারের শত্রুতা করিতেছেন। বিখ্যাত বংশের পরমাসুন্দরী বধূ চিৎপুরে মদনমোহনের মন্দিরের পথে ডাকাতদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হইল। লাঠিয়াল, বন্দুকধারী দারোয়ানের দল রক্ষা করিতে পারিল না। কন্যার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

ইংরাজের চোখে বাংলার মেয়ের রূপ লাগিয়াছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী। প্রসাদ লাভের জন্য সেকালে বাঙ্গালীর দল কাড়াকাড়ি করিতেন। নব-বধূর বিবাহের পূর্বে তার বাড়ীতে দুর্গা-পূজায় সাহেবসুবোদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। টানাপাখার নীচে টেবিলে বিদেশী খাবার খাইতে খাইতে সাহেবরা তয়ফাওয়ালী এবং খ্যামটার নাচ দেখিতেন। হিন্দুস্থানীগতের সঙ্গে ইংরাজিগৎ মিলাইয়া তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য নাটমন্দিরে গান-বাজনা চলিতেছিল।

লম্বা দালানে প্রতিমার সামনে সাহেব-মেম। মাথার উপর টানা-পাখা। এবার বাইনাচ হইতেছে। দালানের দোতলায় বাড়ীর মহিলারাও নাচ দেখিতেছিলেন। দুর্গোৎসবের প্রতিমা ম্লান করিয়া বিবাহযোগ্যা কুমারী মেয়েটির মুখ দোতলা বারান্দায় থামের পাশে ফুটিয়া উঠিল। পেশোয়াজ-ওড়নাপরা বাইজী-শ্রেষ্ঠাকে দেখিতে মেয়েটি ব্যগ্র হইয়া হঠাৎ একজন শ্বেতাঙ্গের দৃষ্টিপথে পড়িয়া গেল। কয়েকদিন পরে তাহার বিবাহ।

সাহেবের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন শেঠজী সেই কন্যাকে বিবাহের পরে অপহরণ দ্বারা। শত্রুর ধর্ম নষ্ট করিয়াছিলেন শেঠজী শত্রুর কুল-বধূকে সাহেবের হাতে তুলিয়া দিয়া।

চীনগামী জাহাজের পাশে গঙ্গার ধারে সাহেব সুন্দরীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সুন্দরী সাহেবের সঙ্গে চীনদেশে নীতা হইল। সে চীনেদের লালসার উদ্দীপক হইল, কি পলায়ন করিয়া নিহত স্বামীর চিতায় 'সতী' হইল, জানা থাকিলেও শেঠজী কাহাকেও জানান নাই। সাহেবের প্রসাদ পাইলেন, কম্পানির দালাল তিনি হইলেন। উত্তর-পুরুষ অস্পষ্টভাবে কথিকা শুনিলেও শেষ জানে না।

অতএব, প্রতাপও শেষ জানিল না। আভাসে পূর্বপুরুষ সম্পর্কে যেটুকু সে জানিত, তাহার পরের অন্ধকারে তেজচন্দ্র আলোকপাত করিলেন না।" শুধু বিষণ্ণ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "স্ত্রীলোকের সর্বনাশ কখনও করতে হয় না।" ঠাকুরদা সেকেলে ছিলেন, ইংরেজি শিক্ষা তিনি

গ্রহণ করেন নি। কিন্তু অন্যায়ভাবে ইংরেজকে সন্তুষ্ট করার ফল ভুগেছিলেন।

তেজচন্দ্র উন্মনা হইয়া চিন্তা করিলেন। শৈশবে ক্যান্সার বা কর্কট ব্যাধিগ্রস্ত ঠাকুরদার যন্ত্রণা তিনি দেখেন। অসহ্য কষ্টে আফিম দিয়া তাঁহাকে অচৈতন্য করিয়া রাখিতে হইত। চীনের আফিম।

যে চীনের সুদূর তীরে হয়তো কোন প্যাপের বীজ রোপণে তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন, সেই চীন বিষফুল অহিফেনের পশরা তাঁহার মৃত্যুকে নিকটবর্তী করিতে পাঠাইল। জাগ্রত অবস্থায় আর্তনাদ, মূর্ছিত অবস্থায় বিষের নেশা—বীর্যশালী বেপরোয়া ডাকাত-সর্দারের অবসান এমন।

প্রতাপ হতাশ মনে দেওয়াল-আলমারীর দিকে গেল। তেজচন্দ্র কিঞ্চিৎ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রতাপ কয়েকখানা মনোনয়ন করিল।

ঠাকুরদা লক্ষ্য করলেন, "পড়াশোনায় ভায়ার ভারী মনোযোগ দেখা দিয়েছে যে! এত রাত্রে শুক্‌নো বই দিয়ে করবে কি? তার চেয়ে এগুলো নাও।" ইঙ্গিতে ভৃত্য প্রতাপের হাতে একগুচ্ছ গোলাপ তুলিয়া দিল।

"ব্ল্যাক প্রিন্স। নূতন গাছে ফুটেছে। তোমার প্রিন্সেস্‌কে সাজাও গো।"

প্রতাপ হাসিয়া ফুল হাতে বাহির হইয়া আসিল। ছোট ভাই প্রায়ই রাত্রে বাড়ী ফেরে না। অতএব তাহার নবোঢ়া গোঁসা করিয়া পিত্রালয়ে থাকে। কলিকাতার সম্পন্ন গৃহকন্যা সে। নীরুর মত পাড়াগেঁয়ে নয়।

নীরুর গোল-ফর্সা, পানের রসমাখা মুখখানার কথা ভাবিয়া প্রতাপের ইচ্ছা হইল লাল ফুলের তোড়াটি রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। পুতুলের মত পটলচেরা চোখ, পাতলা ঠোঁট—বোকা-বোকা। কথা বলিতে জানে না।

ঘরে ফিরিবার পথে কিন্তু অন্য লোকের সঙ্গে দেখা হইল। প্রতাপের কাকিমা গোলাপসুন্দরী। গোলাপের মতই গায়ের রং, মাংসল গোলাপী গালের মধ্যে এখনও টিকলো নাক। টানা চোখের দৃষ্টি মদনাতুর। তবু গোলাপসুন্দরীর স্বামী ঘরে থাকে না।

গালার কাজকরা ফিকে নীলশাড়ীর পাতলা আঁচল যেন অতর্কিতে উড়িয়া প্রতাপের দেহ স্পর্শ করিল। ভাশুর-পুত্রের দিকে ত্রিংশবর্ষীয়া সুন্দরী হাসির তীর নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ফুলশয্যেয় যাচ্ছ না কি গো?"

"গোলাপসুন্দরীর জন্যে গোলাপ। ধরো, নাও!" প্রতাপের মনের একাংশ ছুঁইয়া আছে গোলাপসুন্দরী। সম্পর্কটা কাকিমা-ভাশুরপুত্রের সম্পর্ক নয়। বাটীর বাহিরে আনন্দের জন্য না গেলেও চলে প্রতাপের। বাড়ী তাহাকে বাহিরের বস্তু দিতে পারে।

গোলাপসুন্দরী এধার-ওধার চাহিয়া প্রতাপের গালে আলতা-ছোপা হাতের ঠোনা মারিয়া হাসিল, "বলি, গোলাপসুন্দরীকে গোলাপ দিলে বটে, আসলটা কবে আসছে? তোমার 'পিঙ্কি'? মুখসর্বস্ব তুমি। পুরুষ জাতটাই এমন বটে।"

প্রতাপের মুখ লাল হইয়া উঠিল, হৃদয়স্পন্দন দ্রুততর। গোলাপ-সুন্দরীর ত্বক গোলাপের মত মসৃণ, উজ্জ্বল। দেহ নমনীয়। আস্বাদ প্রতাপের জানা আছে। নির্জন ঘর গোলাপসুন্দরীর, একমাত্র কন্যার বাল্যবিবাহ দ্বারা সে নিষ্কণ্টক। নীল রেশমের জামায় আতরসুবাস ঘরে ভাসিতেছে। কিন্তু আজ প্রতাপ সহজে গোলাপের সঙ্গে যাইতে পারে না। লোক-জানাজানির ভয় নয়। শেঠবাড়ী কেউ কারুর নীতিবোধ লইয়া বিব্রত হয় না। লোকচক্ষে প্রতাপ-গোলাপ-মিলন ধরা পড়িলেও কিছু মনে করিবার নাই। বড়ঘরে এমন হইয়াই থাকে। গুরু-পুরোহিত নীতিশাস্ত্রে অবহিত হোক। শেঠদের ঐতিহ্য 'পুরুতবামুনে' নয়।

বেশ ছিল প্রতাপ শেঠ। গৃহের পরিধির মধ্যে পরকীয়া ছিল,

বাহির জগতে স্বাধীনা নারী ছিল। ঘরে আটপৌরে বোকা স্ত্রী ছিল। সিনেমা দেখিয়া, থিয়েটারে বসিয়া, বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নির্বিবাদে দিনগুলি কাটিত। আর দূর সাগর-কল্লোল তাহার বদ্ধ স্রোতে জাগিয়াছে। নারীর মার্জিত শালীন রূপ তাহাকে স্থূলত্ব হইতে দূরে ডাকিয়াছে। কিন্তু নূতন পথে পুরাতন স্বস্তি-আয়াস খুঁজিয়া পায় না প্রতাপ। সে আক্রোশ বোধ করে। নির্বোধ সে নয়। কেয়া প্রাপ্যনীয়া নয়, বোঝে। তবে, কেন কেয়া তাহাকে ভুলাইল? আয়াস—আরাম ভাল ছিল প্রতাপের। কেয়া তাহাকে শান্তিহীন করিল। কেয়া সোম প্রতাপ শেঠের শত্রু।

'পিঙ্কি' (Pinkie) নামকরণের দ্বারা প্রতাপের একটি স্টীমার ক্রয় করিবার ইচ্ছা। গোলাপসুন্দরী নাম বাংলায় ব্যবহার করিলে অসুবিধা আছে। অতএব, প্রতাপের স্থূলরুচি 'পিঙ্কি' নাম মনোনয়ন করিয়াছে। বাড়ীর সীমানায় নানা গোলযোগ। অতএব কাকিমাকে সঙ্গী করিয়া অগাধসমুদ্রে পাড়ি জমানোর জন্য এবং প্রেমের সাক্ষ্য হিসাবে পিঙ্কি জন্মলাভ করিবে। কিন্তু, সম্প্রতি প্রতাপের হাতে অত টাকা নাই। কোথাও হইতে সংগ্রহের উপায় সে দেখিতেছে না। গোলাপসুন্দরীর অধৈর্য তাগিদে লজ্জার সীমা নাই তাহার।

গোলাপসুন্দরী গোলাপের ন্যায় ঠোঁট ফুলাইয়া আবার বলিল, "কি গো, বাক্য হরে গেল না কি? প্রথম যাত্রা হ'বে সুন্দরবনে। জামা-কাপড় গুছিয়ে ফেললাম। প্রথমবার নীরুকে নিতে হবে। তারও যোগাড় হ'ল। জাহাজের দেখা নেই। ভালবাসলে এতদিনে ব্যবস্থা হয়ে যেত। যেচে মান আর কেঁদে-সোহাগ। 'তোমার নামে জাহাজ হবে। তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবো।' ছ'মাস ধরে কত কথাই শুনলাম। এতও ছল পুরুষে জানে গো।"

গোলাপসুন্দরীর বাক্যবিন্যাসে প্রতাপ মরমে মরিল। খপ্ করিয়া গোলাপের বারখানা করিয়া চুড়ি-পরা হাত হাতে চাপিয়া

বলিল, "কথা যখন দিয়েছি, পাবে নিশ্চয়! কতকগুলো ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে চেপেছে। একটু সামলে নিতে দাও।"

প্রতাপের 'ঝঞ্ঝাট' অর্থাৎ কোন নারী-সম্ভব উদ্বেগ। ভালোই জানে গোলাপ। কিন্তু ঈর্ষা হয় না। প্রতাপের আসক্তি গোলাপের ন্যায্য দায়ী নয়, উপরি পাওনা। বুদ্ধিমতী সে। বিবাহিতা পত্নীর প্রথায় স্বামীর নৈতিক চরিত্র লইয়া মাথা ঘামায় না। প্রেমিককে বেশী চাপ দেওয়া চলে না। যেখানেই যাক সে, গৃহে ফিরিতে হইবে। আর জানে, প্রতাপের তাহার দিকে আসক্তি কত তীব্র। মাটির বন্ধনে মাটির সঙ্গে বাঁধা যে সত্তা, সে আকাশে উঠিতে চাহিলেও মাটি তাহার শেষ কামনা।

মাতার পরিচায়কা দুইপাত্র সিদ্ধির শরবত স্টীলের থালায় সাজাইয়া আনিল, "বড় মাইজী দিলেন।" ছোট মায়ের সঙ্গে পুত্রের সংসর্গে মাতা তিলমাত্র বিচলিতা ন'ন। বরঞ্চ, বাহিরের বাজারে ছোটাছুটি করিয়া টাকা-ওড়ানোর চেয়ে ঘরে ঘরে ব্যবস্থাটা ভাল। বৌ বোকা, পুত্র আধুনিক, ছোটজা স্বামী-সুখবিরহিতা। তিনজনের সামঞ্জস্য বিধান হইয়াছে। ছোটবৌ মান করিয়া পিত্রালয়ে গমন করিয়াছে, ছোট জা বাড়ী ত্যাগ করিলে বাড়ী খালি হইয়া যাইবে। অপুত্রক ছোট দেবরের সম্পত্তির অংশীদার স্ত্রী। সে পিত্রালয়ে গেলে ছোট দেবরের অবর্তমানে বিষয়ের অংশ ছোটজায়ের পিত্রালয়ে যাইবে। সুতরাং, এখানে ভুলিয়া থাকা সংসারের পক্ষে মঙ্গল। অতিরিক্ত নেশায় ছোট দেবরের ঘড়িতে বারটা বাজিয়াছে।

মনোহর শেঠের বাঁধা রক্ষিতা এক থিয়েটারের কীর্তনওয়ালী। মনোহর চরিত্রবান। দ্বিতীয়া-স্ত্রী হিসাবে কীর্তনওয়ালীকে রাখিয়াছে। ধর্মও হয় কীর্তন-শ্রবণে। দ্বিপ্রহরে আহারাদির পরে ঘণ্টা দুয়েক সেখানে কাটায় মনোহর। সন্ধ্যাবেলা তাহার ব্যবসায়িক কাজের পালা। সুতরাং মনোহরের স্ত্রী স্বামীগৃহে থাকিতেও স্বামীসুখ পান না। মেজাজ সপ্তমে চড়িয়া থাকে তাঁহার।

প্রতাপ যথারীতি ঢোলা ধুতির সাজে আহারে বসিল। এখন শয়নের পালা। নীচে পিতার কাজকর্ম আহারাদি হইয়া গিয়াছে। তিনি বাঁধা গায়কের মুখে গান শুনিতেছেন। মনোহর সঙ্গীতানুরাগী। তাঁহার প্রিয় তুলসীদাসের গীত হইতেছে :—

"সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাঈ।
রসনা রস-নাম লেত সন্তনকো দরশ দেত
বিহসত মুখ মন্দ চন্দ সুন্দর সুখদাঈ॥"

প্রতাপ পিতার বৈঠকখানার দিকে বারান্দায় দাঁড়াইল। পিতা ভজন কীর্তন ইত্যাদি সঙ্গীত ভালবাসেন। সঙ্গীতেও তাঁর রুচি বাঙালী-সুলভ নয়। মাড়োয়ারী খাতককে প্রীত করিবার জন্য তুলসীদাস। ঠাকুরদাদার গোলাপের ও পিতার তুলসীদাসের ভজনের পটভূমিকায় প্রতাপের সৌন্দর্যপ্রিয়তা। প্রতাপ তবু মাড়োয়ারী সাজিতে চায়, কারণ তাহারও নিজস্ব ব্যবসায় মাড়োয়ারীর সহিত।

স্টীমারটি না কিনিলে গোলাপসুন্দরীর কাছে মুখ দেখানো যাইবে না। ফিল্ম কম্পানির শেয়ারে বিস্তর অর্থ ব্যয় হইয়াছে। এখন নূতন টাকা পাওয়া শক্ত। শেঠমলের ছোট ভাইএর নিকট হইতে ব্যবসার জন্য টাকা পাওয়া চলে। কিন্তু, তাহাকে প্রথমে হাতে আনিতে হইবে। শেঠমলের ভাইএর আধুনিকা বাঙালী কন্যার সহিত খুব মেলামেশার শখ। পছন্দসই একটি যোগাড়ে থাকিলে তাহাকে ধরা চলিত। প্রতাপের নিজেরি যে তেমন ভদ্র বাঙালী কুমারী জানা নাই।

প্রতাপের অধরে হঠাৎ ক্রুর হাসি খেলিয়া গেল। কেয়ার জন্য সে ফিল্ম কম্পানিতে অনেক টাকা ঢালিয়াছে। চম্পাকে শেঠমলের ভাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলে কেমন হয়? চম্পাকে তাহার দরকার কি এই জন্য? কেয়াকেও তাহার গর্বের জন্য, প্রতাপকে অশান্তি দিবার জন্য লাঞ্ছিত করা হইবে।

দাঁত খোঁটাইতে খোঁটাইতে প্রতাপ বাথরুমে প্রবেশ করিল।

তাহার মুখ দেখিলে কেয়া সোম নিজের অস্বস্তির কারণ খুঁজিয়া পাইত। সুন্দর মুখে প্রতাপ শেঠের শয়তানের ছায়া।

বিভিন্ন উপাদানে পূর্ণ শেঠবাড়ীর ভিত্তি প্রতিধ্বনিত করিয়া তখন সকরুণ ভক্তিসঙ্গীত উচ্ছ্বসিত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে :—

"সুরনর-মুনি সকল দেব শিব বিরিঞ্চি করত সেব
কীরতি ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড তীন লোক ছাই।
সখা সহিত সরযূতীর বৈঠে রঘুবংশ-বীর
হিরখি নিরখি তুলসীদাস চরণন রজ পাঈ॥"

সাটিনের শয্যার উপরে সরু মেদিনীপুরী পাটি, ভিজে গামছায় ঝি মুছিয়া রাখিয়াছি। ত্রিপদীর বুকে রূপার থালায় বেল-কুঁড়ির মালা। জানলা-দরজার গুটানো খস্‌খস্‌ এখন আর্দ্র সৌরভদাতা। নীল স্বপ্নালু আলোর ছায়া মেহগিনী পালঙ্কের ছত্রিসংলগ্ন হাল্কা-নীল নেটের মশারীর গায়ে। প্রতাপ শায়িত হইল। পাশের জোড়া-খাটে নীরুর নাসিকা-গর্জন শুনিতে শুনিতে স্বপ্ন দেখিল, গঙ্গার তীরে জব চার্ণক সুন্দরীর হাত ধরিয়া জাহাজে তুলিতেছেন। চীনে মাঝি-মাল্লা সাহায্য করিতেছে।

দূরের ঘরে সাদা মসলিনের চাদরের উপর তেজচন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সারা ঘরে গোলাপমথিত সুবাস। ঠাকুরদাদার যন্ত্রণা-চীৎকার নৈশশান্তি যেন আজও ব্যাহত করিয়া ফিরিতেছে। সাবধান! বংশলতায় পূর্বপুরুষ আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। পুরাতন লোভ, পুরাতন মোহ তাহার বুকে বাঁধা থাকে। পুরাতন পথেই তাহার আত্মার গতি। শতাব্দীর পারে পারে অতৃপ্ত আত্মা আধার খুঁজিয়া মরে। শতাব্দীর তীরে চেনামুখ আবার তাহাকে পথ ভোলায়। ভ্রান্ত মানবাত্মার মুক্তি কোথায়? ঈশ্বর, তুমি তাহাকে রক্ষা কর। যেন সে আবার ভুল না করে।

"এত দেরি হ'ল, দিদি!"

গোপনচারিণী গহন রাত্রি রাস্তায় অন্ধকারাবৃতা। ত্রিতল রক্তচন্দন রংয়ের বাড়ীর একতলার ফ্লাটের আলো এখনও নেভে নাই। দ্বিতলের ভাড়াটিয়া, ত্রিতলে গৃহকর্তাদের যামিনী সুপ্তিমগ্না। একতলায় কেয়া সোমের ঘরে আলো জ্বলিল।

চম্পা পরীক্ষার পড়ার খাতিরে রাত্রি জাগে। একটি সপ্তাহ পরে বি-এ পরীক্ষায় তাহাকে বসিতে হইবে। পিতা নিদ্রাগত, মাতা এপাশ-ওপাশ করিতেছেন। খাবার ঘরের টেবিলে বইখাতা ছড়াইয়া চম্পার পড়া চলে। তিনখানা ঘরে অত্যন্ত স্থানাভাব। বাইরের ঘরখানা আটপৌরে কাজে ব্যবহার হয় না।

কেয়া সাদা লেসের একমুঠো সাদা পাখীর পালকের মত হাল্কা শাড়ীটি সযত্নে আলনায় রাখিয়া ধূসর রেশমের জামাটি উন্মোচন করিল। হাতের লেস-বসানো রুমাল কপোলে স্পর্শ করিয়া বলিল, "এত রাত্রি জেগে পড়া ভাল নয়, চম্পা। পরীক্ষার আগে মাথা গুলিয়ে ফেলবি।"

দীর্ঘ বেণীটি বুকের উপর টানিয়া আনিয়া চম্পা পাখার সুইচ খুলিল। "যা গরম! কি করব রাত জেগে না পড়ে? সন্ধ্যেবেলায় আজ যে পড়া হ'ল না।"

রূপালী-ধূসর চটি আর হাতের ব্যাগ জুতোর বাক্সে ও দেরাজে যথাক্রমে রাখিতে কেয়া ব্যস্ত ছিল। উদ্বিগ্ন মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, "কেন? মায়ের বুঝি আবার জ্বর এসেছে?"

"না গো না, তোমার বন্ধুরা এসেছিলেন। তুমি তো দিব্যি দাদার সঙ্গে সুমিত্রা চন্দের নেমন্তন্নে গেলে, এধারে যে প্রতাপবাবু তাঁর একজন বন্ধুকে নিয়ে এসে ফিরে গেলেন।"

ইতিমধ্যে বার কয়েক প্রতাপ শেঠ যাতায়াত করিয়াছে। কেয়ার দাদা কেশরকে একদিন গাড়ী করিয়া বিদেশী অর্কেষ্ট্রা শুনাইয়া আনিয়াছে। কেয়ার বৃদ্ধ মাতাপিতার সহিত পরিচিত হইয়া বিনয়ী নাম কিনিয়াছে। একদিন ফুল, অন্যদিন ডালমুট, তৃতীয় দিন শুক

মেওয়া নানা কৌশলে উপহার দিয়া গিয়াছে। দোষ ধরিবার সাধ্য কেয়া সোমের হয় নাই। মধুর ব্যবহার, বিনয়ী বাক্যালাপ ও রূপময় আকৃতির জন্য প্রতাপ শেঠ অতি সহজে সোম পরিবারের বন্ধু হইয়াছে।

প্রতাপ আসিয়াছে এই বার্তা কেয়াকে বিস্মিত করিল না। কেয়া শুধু জানিতে চায় প্রতাপের বন্ধু কে?

"ওঁর বন্ধুটিও চমৎকার লোক। বাবার সঙ্গে কত দেশ-বিদেশের শেয়ার মার্কেটের গল্প করলেন। তোমার দেরি দেখে শেষে ওঁরা হতাশ হয়ে উঠে গেলেন। খুব মজা করে এলে, না দিদি?"

"বন্ধুটি কে?"

"বন্ধুটির নাম গণেশ শেঠমল। স্বরূপপ্রকাশ শেঠমলের ছোট ভাই।"

"স্ব—রূ—প—প্রকাশ শেঠমল! তারা যে মস্ত বড় লোক, কোটিপতি। তার ভাই গরীবের বাড়ী কেন?" কেয়ার মুখে কৃষ্ণছায়া।

"আহা দিদি, তুমি বড় সন্দেহকাতুরে। গণেশবাবুর ভারি শখ বাঙালীদের সঙ্গে মেশেন। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে তিনি নিয়মিত শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করতেন, জানো?"

এবারে কেয়া হাসিয়া ফেলিল, "কালচারের কি জ্বলন্ত উদাহরণ।"

"গণেশবাবু তাঁর গাড়ী করে এসেছিলেন। কি গাড়ী জানো? এই রাস্তায় আগে থামেনি সে গাড়ী,—রোল্‌স্ রয়েস্।"

একটু খর স্বরে কেয়া বলিল, "দেখে জীবন ধন্য করে নিয়েছিস্ তো?"

চম্পা বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া বলিল, "রোলস্ রয়েস্ তো আগেও দেখেছি। তোমার নাম হয়েছে। কলকাতায় সকলে চেনে। কেউ দেখা করতে এলে সেটা সহজ ভাবে নাও না কেন?"

কেয়া সোম লজ্জিত হইল।

কেয়ার ঘরের প্রান্তে ছোট তক্তপোশে রাত্রে চম্পাকে শুইতে হয়। দিনের বেলা অবশ্য কেয়া একাই ঘরের দখলী স্বত্ব পায়। আজ রাত্রে

ঢিলে সেমিজ, সাদা শাড়ী পরিয়া টেবিলের দিকে যাইতেই করুণ আবেদন কানে আসিল, “বড় ঘুম পেয়েছে। আজ আর আলো জ্বেলে লিখতে বোস না, দিদি।”

প্রায় এক ডজন গানের ফরমাশ আছে। সিনেমা কম্পানির কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই। অমর রায়ের গল্পটি মনোনীত হইয়াছে। কর্মকর্তারা মহিলার কৃতিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসী নহেন তিলমাত্র। বিশেষতঃ যখন সে মহিলা শান্তি সেনের ন্যায় বিগতযৌবনা। এখন ঘন-ঘন মিটিং-এর ক্ষেত্র নাই। তবে স্ক্রীন্-প্লে লেখা শুরু হইয়াছে। শেষ হইলেই গানের পালা। কেয়া তাই আগে অন্য কাজ সারিয়া রাখিতে চায়।

যাই হোক, চম্পার পক্ষে এখন নিদ্রা প্রয়োজন। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে অন্ধকার ঘরে কেয়া শয্যালগ্ন হইল। বাইরের ঘরে তখন শেখরের চোখে হয়তো স্বপ্ন নামিয়া আসিতেছে। স্বপ্নের পরী তাহার সুমিত্রা চন্দ।

অন্ধকারের মধ্য হইতে চম্পার প্রশ্ন আসিল, “কি খাওয়াল? ওরা তো খুব সম্ভ্রান্ত লোক।”

“বুফে ডিনারের ব্যবস্থা ছিল। প্রচুর আয়োজন।”

চম্পা বলিল, “তোমার কি মজা, না? নাম হয়েছে। সবাই তোমাকে ‘লায়োনাইস্’ করতে চায়। সুমিত্রা দারুণ একখানা সাজ দিয়েছিল, না?”

“হ্যাঁ, স্যামন্ পিঙ্ক শাড়ী-জামা পরেছিল। চমৎকার দেখাচ্ছিল।” চম্পা উৎসাহে বিছানায় অর্ধ উপবিষ্ট হইল, “একটু গল্প কর না, দিদি। সুমিত্রার চেহারায় বিশেষত্ব কি জান? মুখ দেখে মনে হয়, ভারী মিষ্টি একটি ঘরোয়া মেয়ে। অথচ—”

অথচ, অথচ। পাথর বসানো লাল চটী সুমিত্রার আলোর নীচে চলাফেরায় জ্বলে। যন্ত্র-কুঞ্চিত চুলে প্রখর ল্যাভেণ্ডার, হাতকাটা জামার হাতে মুক্তাবসানো রেশমের ট্যাসেল। বিদেশী করসেটের

বন্ধনে সুমিত্রাতনু। রক্তিম অধরে কখনও লম্বা হোল্ডারে সিগারেট, কখনও কক্‌টেলের পাত্র। এই সুমিত্রাকে ভালবাসে বিত্তবিহীন শেখর সোম। উগ্রা আধুনিকার মুখে-চোখে কোথাও কিন্তু উগ্রতা নাই, আছে আমন্ত্রণ। কক্‌টেলের পাত্র অধরে ধরিলে মনে হয় মিছরীর শরবত সে নিরীহ পানীয়। সিগারেট জ্বালাইলে মনে হয় দুষ্ট মেয়ে বুঝি বড়দের অনুকরণে আমোদ পাইতেছে। শেখর মন্ত্রমুগ্ধ সুমিত্রা-মন্ত্রে।

চম্পা বলিয়া চলিল, "দাদার সঙ্গে যা গ্র্যাণ্ড মানাতো। সুমিত্রা অন্যকে বিয়ে করলে দাদা মরেই যাবে।"

ফেরার পথে ভাড়া ট্যাক্সিতে কেয়া দাদাকে তিরস্কার করিয়াছিল, "মুখটা মুছে ফেল। লিপ্‌স্টিকের দাগে ভর্তি।"

শেখর বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া রুমালে রঞ্জনীরাগ অপসৃত করিয়া বলিল, "দেখ কেয়া, আজ সুমিত্রা আমাকে আড়ালে ডেকে নিল কেন, জানিস?"

কেন ডাকিয়াছিল? আধুনিক প্রথায় বিবাহপ্রাক দেহলীলার সঙ্গী হিসাবে নিশ্চয়। তবুও, বিবাহ স্থির নয়, সুমিত্রার বহু প্রার্থী। রূপাঞ্জন ভিন্ন রজত কৌলিন্য শেখরের নাই। সুমিত্রা বাক্‌দান করিবে না।

পুরুষস্পর্শবিহীন সুকোমল অধর কেয়ার কম্পিত হইল বিতৃষ্ণায়। সে খেলা করে না। তাহার সমগ্র দেহমন সে অর্ঘ্যের মত পবিত্র রাখিয়াছে। কাহার উদ্দেশে?

শেখর বলিল, "সুমিত্রার বাবা একটা বড় কাজে আমাকে ঢুকিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু, অন্ততঃ দশহাজার টাকা জমা দিতে হবে জামিন। তবেই পাওয়া যেতে পারে। সুমিত্রা বলল, টাকাটা যোগাড় করে কাজটা নিতে। তাহ'লে—বুঝতেই পারছিস বিয়ের বাধা থাকবে না।"

দশ হাজার কেন দশ শত টাকাও তাদের যোগাড়ে নাই। অতএব কেয়া নিস্তব্ধ রহিল। শেখরও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। কলিকাতার তৃষিত হৃদয়ে আরও একটি দীর্ঘ নিশ্বাস।

চম্পা বলিল, "আমরাই কিছু করতে পারছি না। দাদার মত ছেলে সামান্য চাকরিটা নিয়ে ঘানি ঠেলছে। অথচ গণেশ শেঠমলের মত একটা ক্যাড রোলস্ চড়ে বেড়ায়!"

"শুধু গণেশ শেঠমলের ওপর বিদ্বেষ কেন, চম্পা? প্রতাপ শেঠও তো যথেষ্ট ধনী।"

চম্পার কপোল অন্ধকারে উষ্ণ হইয়া উঠিল, "প্রতাপবাবুর কালচার আছে।"

"কালচারের সন্ধান পাইনি এখনো, তবে রূপ আছে।"

চম্পা তাড়াতাড়ি কথার সূত্র ভিন্ন গতিতে ফিরাইল, "গণেশবাবু একদিন আমাদের রোলসে চড়াবেন।"

"চম্পা! হ্যাংলামো করেছ বোধ হয়? প্রতাপবাবু আমার সহকর্মী। গণেশ শেঠ কে? তার গাড়ীতে আমরা চড়বো কেন?"

"বারে, দাদাকে খুঁজছিলেন। বন্ধুত্ব হবে ওরও সঙ্গে। প্রতাপবাবুর দাদাকে বড্ড ভাল লেগেছে, তাই গণেশবাবুরও দাদাকে চাই। লোকে মিশতে এলে এমন কর কেন, দিদি?"

অন্ধকার স্পন্দিত করিয়া কেয়ার কণ্ঠ খাদে বাজিল, "চম্পা, অবস্থার এত তফাতে বন্ধুত্ব হয় না। রাত হয়েছে। এখন ঘুমোও। পরীক্ষার আগে রাত জাগা ভাল নয়।"

অন্ধকার একটুক্ষণ পরেই চম্পার সুপ্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিল।

আজ কেয়ার চোখ নিদ্রাহারা। কেয়ার মন চিন্তাপীড়িত। বহুক্ষণ সুমিত্রা চন্দকে দেখিয়াছে কেয়া। বুঝিয়াছে তাহাকে ভালবাসিলে ভোলা সম্ভব নয়। তাহারা সম্প্রতি দরিদ্র, কেশর কেন আকাশের চাঁদে প্রাণ দিল?

গানের রচনায় কেয়া স্বনামধন্যা। গানের দ্বারা অর্থ আসিলেও কবিতা ও কথাসাহিত্যে কেয়ার দক্ষতা স্বীকার্য। নিজের লেখা একটি কাব্যাংশ মনে পড়িল—

অনেক লাবণ্য নদী হারালো সলিল
তার তনুসাগরের প্রমত্ত সঙ্গমে;
দু'চোখে জাগর উষা আজও অনাবিল;
ঠোঁট দু'টি রসঘন চুম্বন-স্মরণে
ও দেহ অধীর যেন বাসনার হ্রদ,
আমাকে মরাল করো, ওগো বরতনু,
ছাড়বোনা একপল—রইলো শপথ,
তীরে-গাঁথা দেহমন—তুমি ফুলধনু।

সুমিত্রা সেই লাবণ্যের নদী। সহোদরা প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল কেয়ার। যুগে যুগে সহোদরের ভালে চন্দন লেখার মুহূর্তে বাংলার বোন মনে যে মঙ্গল কল্যাণ পোষণ করে, তাহাই কেয়ার মন প্লাবিত করিয়া দিল। সুমিত্রাকে কেশরের হাতের মধ্যে তুলিয়া দিতে কেয়া সব পারে। কিন্তু তুচ্ছ কেয়ার সাধ্য কি?

চম্পার জন্য চিন্তা নাই। বি-এ পাশ করিবার পরেই চম্পার বিবাহ হইয়া যাইবে। মাতার বান্ধবী-সুত জার্মাণি হইতে স্থপতিবিদ্যা শিখিয়া ফিরিলেই বিনাপণে চম্পা সে গৃহে যাইবে। চম্পকবরণীকে অফিস বা স্কুলে ছুটিতে হইবে না। কিন্তু, এমন ঘটকালির বিবাহ কেশরের জন্য নয়। পিতার অর্থক্ষয়ে সে ক্ষতিগ্রস্ত, অবাঞ্ছিত কর্মের গ্লানির ভারে কেশর ম্রিয়মাণ। সুমিত্রাকে ভিন্ন কেশরের পত্নীপদ পূর্ণ হইবে না।

হওয়াও উচিত নয়। প্রেম যদি জন্মলাভ করিল, তবে কেন প্রেম ব্যর্থ হইবে? কেশর টাকার যোগাড় করিতে পারিলে বড় চাকুরি হইবে, সুমিত্রা আশ্বাস দিয়াছে। টাকা কোথায়?

প্রতাপের কত টাকা! কেশরের নাই কেন? বহু আলাপে প্রতাপ শেঠ এখন বন্ধু। সিনেমা কম্পানির বাড়ীটিতে যাওয়া কিছু দিন বাদ পড়িয়াছে। সুতরাং অতীত এখন নীরব।

প্রতাপের সম্পর্কে যাহা বলিতে চাহিয়াছিল, আর বলিবে না। কেয়া যদি সাবধান না হয়, অতীতের শঙ্কা দিয়া অতীত কেয়াকে আচ্ছন্ন করিলেও কেয়া যদি পলায়ন না করিয়া থাকে, তবে অতীত আর কি করিতে পারে? প্রাক্তন অতীতের অপেক্ষাও শক্তিশালী। সে অতীতকে অতিক্রম করিবে।

সুমিত্রা সম্পর্কে নিজের কবিতাটি মনে পড়িল।

সম্পাদক আদিরসাশ্রিত বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু কেয়া সংস্কৃত কাব্য উদ্ধৃত করিয়া নিজের রচনার নির্দোষিতা প্রমাণ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বিদেশী লেখকের ব্যাখ্যা নজির হিসাবে কেয়াকে উপস্থিত করিতে হইয়াছিল সেদিন। সুমিত্রাকে প্রথম দিন দেখিয়া সহোদরের মানসিক বিপ্লব কেয়া অনুমান করিতে পারিয়াছিল। অনুজার কলমে অগ্রজের মনোভাব প্রকাশিত হইয়া কবিতাটি বিচিত্র করে। সেই সুমিত্রাকে হারাইলে কেশর নাস্তি।

কেয়ার মনে কবিতার চরণ ভাসিতে লাগিল। রোমাঞ্চ শিহরণে নিদ্রাহীন নিশা মথিত। পুলক স্বেদমণ্ডিতা রাত্রি। বাসনা-মণ্ডপে আত্ম-উৎসর্গ করা যায় এখন। আপাপবিদ্ধা কুমারী কেয়া সোমের কলম কিন্তু অভিজ্ঞ। মদির প্রেম ব্যাকুল ভাষায় স্বীকার করিবার সাহসে তাহার সৃজন বিশিষ্ট। কিন্তু, চির-পিপাসিতা কেয়া সোমের সতী-সত্তা আজও কাহার অপেক্ষা করে?

চম্পার ব্যবস্থা স্থির, শেখর মনের মানুষ পাইয়াছে। কিন্তু, কেয়া সোম, তুমি কি বিফল যামিনী কাটাইবে? রাত্রির প্রহরে যে বাসনা হ্রদ, কেয়া, তুমি কেন তার বুকে মরালী হও না? শুষ্ক দিনের, দগ্ধ রাত্রির সমিধ দিয়া তুমি চিতা প্রস্তুত করিয়াছ নাকি? কেয়া সোম, কোন্ অনাগতের চিতায় সতী হইবার তুমি প্রতীক্ষা কর?

রাত্রির শেষ যাম। কেয়ার ঘুম ভাঙিল দুঃস্বপ্নের অকস্মাৎ

অবসানে। কেয়া চোখ মেলিল। গভীর রাত্রির বক্ষে আবার স্বপ্ন, আবার অজানার পদক্ষেপ।

কেয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শয্যা ত্যাগ করিল। ঠাণ্ডা একগ্লাস জল সেবনান্তে কোণের টেবলের ক্ষীণ টেবল-ল্যাম্পটি জ্বালিল কেয়া। চম্পার সুপ্তি ব্যাহত হইবে না।

ঘুমাও চম্পা, সাতভাই চম্পার মত ঘুমাও। পারুলদিদি তোমাকে কখনও জাগিয়া উঠিতে বলিবে না।

বহু ব্যবহৃত পার্কার ফিফটি-ওয়ান কাগজের বুকে রেখা লিখিল। কেয়ার স্বপ্ন কি জানি না। সুস্পস্ট উপলব্ধি কেয়ারও নাই। কিন্তু, ভাঙা-ভাঙা ছবি কেয়ার রচনায় ধরা দিল।

নিষ্পাপ নিশিযাপন কেয়ার। মনের পথে পথিক আসে নাই। কিন্তু, রাত্রির সমাপ্তি প্রহর কেন কেয়াকে স্বপ্নভাবে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল? দেহ ও মনের কুমারী শুচিতা অগ্নিবাসরে জন্ম-জন্মান্তরের দয়িতের উদ্দেশে উন্মুখ। আত্মবিসর্জনে আপত্তি নাই। প্রাত্যহিক দিনযাত্রার অবান্তরতা কেয়াকে বন্ধন দিতে পারিল না। মুক্ত যাযাবর আত্মবিস্মৃত ইতিহাসের পাতা খুঁজিয়া মরে। বাংলার আকাশে-বাতাসে পুঞ্জীভূত গ্লানি, বহু দিবসের অত্যাচারিতা বাংলা মেয়ের দুঃখে হয়তো একদিন শ্রাবণের প্লাবন নামিবে। আজ বাংলার আবহাওয়ায় শুষ্কতা।

আকাশে ক্ষীণ চন্দ্র—অতীতের সাক্ষী। ও অনেক দেখিয়াছে। অনেক রাত্রির কদর্যতার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত সৌন্দর্যপরিমণ্ডল রচনান্তে নির্নিমেষে পথ চাহিয়া আছে। মুণ্ডিত মস্তক, রিক্তশ্রী শুভ্রথানবস্ত্রা ষোড়শীকে একাদশীর বিধান দিয়া সমাজ সত্তরে কিশোরীর পাশে পুষ্পশয়নে বসিয়াছে। চিতার আগুনে পুষ্পসুকুমার তনু নিক্ষেপ করিয়া সাধু সাজিয়াছে। কুলীন-কন্যাকে চির ব্রহ্মচর্যে অভিশপ্ত করিয়া পাইকারী বিবাহের দ্বারা ধর্ম রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে। চাঁদ দেখিয়াছে, চাঁদ প্রতীক্ষা করিয়াছে।

চাঁদের নীচে দৃপ্ত পদক্ষেপে এক রামমোহন আসিয়াছেন, এক বিদ্যাসাগর আসিয়াছেন।

তবু আজও চাঁদের নীচে ঘাসের ডগায় শিশিরে শিশিরে কত না-ফেলা চোখের জল। স্বাতী নক্ষত্রের কিরণবর্ষণে সেই অশ্রু সাগর-বুকে শুক্তিগর্ভে মুক্তা জন্ম নিয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাপি বাংলার মেয়েকে উপঢৌকন হিসাবে বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিয়াছে। পুরুষের লোভ। রবীন্দ্রনাথ কাঁদিয়াছেন; আইন প্রণয়ন হইয়াছে। বাংলার মেয়ে তবু ব্যথিত।

কেয়ার ঘরে টেবল-ল্যাম্প। কেয়া সোমের স্বপ্ন কবিতার মধ্যে ধরা দিল।

কেয়া সোমের কবিতা

অকলঙ্ক সেই রাত্রি রজনীর অন্তিম প্রহরে
জাগালো প্রখর দীপ্তি আত্মার অমেয় আত্মত্যাগ—
ইসারা ছড়ালো পথ,
ভোগের জটিল পথপারে
একটি মুহূর্ত ফোটে, জীবনের রিক্ত দায়ভাগ।
আমার আত্মারে হানো, মূঢ় যাযাবর,
অপগত হোক তমো, ভেঙ্গে যাক ঘর।

রাত্রির সৈকতে আমি শেষে অবগাহনের
স্খলিত বসনপ্রান্ত, এলায়িত কেশভারবহা,
দাঁড়ালাম।
বহ্নিমান দিনের চিতায়
লিখে দিল শেষ সূর্য জীবনের অন্তিম বিদায়,
মন্ত্রবদ্ধ মৃত স্বামী প্রদীপ্ত চিতায়।
হায় দিবাকর,
কেবলি কি অস্তমান পলাশী-প্রাঙ্গণে,

কেবলি কি অস্তমান সপ্তগ্রাম-কূলে,
হার্মাদের দুরন্ত প্রহারে ?
হায়, বারে বারে
অস্তমান হও নাই চির অন্ধকারে
বাংলার নারীদের আত্মবিসর্জনে ?
আহা দেখ রাত্রির চিতায়
আমারই সকল দেহ জ্বলে জ্বলে যায়,
জ্বলে যায় শতাব্দীর পারে।
আমার আত্মারে হানো, মূঢ় যাযাবর,
অপগত হোক তমো, ভেঙ্গে যাক ঘর।
ক্ষুরধার পন্থার সীমায়
অতীতকে ডাকে চিত্ত—ফিরে পেতে চায়
হারানো বিগত দিন। তবু বিস্মরণ,
অনন্ত মরণ
হায়, দেখ ব্যাপ্তমান দীপ্ত চেতনায়,
অন্ধ সত্তা বিহ্বল ব্যথায়
ফিরে চায়—ফিরে ফিরে চায়।
রাত্রির সীমান্তে জ্বলে মুক্তা-ললাটিকা,
সে কি চাঁদ ?
সে কি সূর্য পূর্বাশার জাগর আকাশে ?
এখনও কি সময়ের চির-বিলম্বন ?
যুগস্রষ্টা নামেনি কি ধরিত্রীর মুমূর্ষু বাতাসে ?
সহস্র আধারে আমি এক জ্যোতির্ময়,
যুগে যুগে একই কান্না, একই দুঃখ নিশির ভুঞ্জন
ক্রমাগত এই দেশে বিদেশীর লোভের পূরক,
রমণীর দেহ-আত্মা ব্যবসা-কন্দুক
তুলে দিল যারা, তারা কোন্ গৌরবের

পাপপঙ্কে মজ্জমান?

আমি যাযাবর,

আমাকে ঘিরেছে তমো কত জন্মান্তের।

দীপ্ত সত্তা, আলো দাও—ভাঙো খেলাঘর।

কেয়া সোমের কবিতার উপর রাত্রি অস্ত গেল।

কেয়া সোমের রচনার উপর রাত্রির অন্ধকার নামিলেও যথানিয়মে প্রভাত হইল। যথানিয়মে চম্পার বি-এ পরীক্ষা আসিল ও নির্বিঘ্নে শেষ হইল।

একদিন টিফিনের সময় প্রতাপ শেঠ বন্ধুত্বের তাগিদে চম্পার খবর লইতে গিয়াছিল। আর একদিন গণেশ শেঠমলের সঙ্গে গিয়াছিল। কিন্তু কেয়ার সঙ্গে গণেশের দেখা হয় নি। অনিবার্য-রূপে হইয়া গেল চম্পার পরীক্ষার পরে বাড়ীর আসরে।

সভাগৃহ হইতে সন্ধ্যা রাত্রে বাড়ী ফিরিবার মুখে গণেশের সঙ্গে কেয়ার মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। বাইরের ঘরে আড্ডা চলিতেছে, প্রতাপ, গণেশ, কেশর ও চম্পা।

ভাদ্রের গুমোট বন্ধ ঘরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কারণ সবেগে ঘূর্ণ্যমান পাখার নীচে শীতল শরবতের পাত্র, টেবিলে বিরাট রজনীগন্ধার ঝাড়। সাকির মত শরবতের জাগ্ হইতে পানীয় কাঁচের গ্লাসে ঢালিয়া বিতরণ করিতেছে চম্পা।

"এই যে দিদি, এসে গেছ। আজ তুমি তাড়াতাড়ি ফিরবে ভরসায় এঁরা বসে আছেন।"

মুখের শরবত নামাইয়া প্রতাপ উঠিয়া কেয়াকে অভ্যর্থনা করিল। দেখাদেখি গণেশও দাঁড়াইল।

সুর্মাটানা ছোট চোখ, ফর্সা ফোলা-ফোলা মুখখানা গণেশ শেঠমলের। দৃষ্টিক্ষেপ মাত্রে কেয়ার মন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল।

প্রতাপ শেঠকে দেখিয়াও অস্বস্তি হইত। বন্ধুত্বের মধুর প্রলেপে

প্রতাপ সেই অস্বস্তির নিরসন করিয়াছে। এখন প্রতাপ কেয়ার কাছে নিরাপদ। প্রতাপ কেয়ার কাছে পুরাতন, বাড়ীর আসবাবের মতই পুরাতন। কিন্তু, আবার প্রতাপের বন্ধু কেন সেই অস্বস্তির তারে ঘা দেয়?

কেয়া নিজের মনোভাবকে সবলে দমন করিয়া গৃহের আনন্দ-আসরে প্রবেশ করিল। বঞ্চিত-ব্যথিত কেশর, ঐশ্বর্যহীন বাড়ী, অলস চম্পার দিনযাত্রায় যদি এরা একটুও আনন্দ আনিতে পারে তবে কেয়াও সুখী হইবে।

অবাঙালী টানের বাংলায় গণেশ শেঠমল বলিল, "এতদিন এসে আপনার দেখা পাইনি, মিস্ সোম। আজ আমার ভাগ্য। আমি আপনার লেখা ভারী পসন্দ করি।"

"ধন্যবাদ।" স্বল্প কথায় কেয়া ভদ্রতা বজায় রাখিল।

প্রতাপ খবর দিল, "সিনারিও লেখা শেষ হয়ে গেছে। এবারে আবার সকলকে বসতে হবে। আপনার গানগুলোও লিখে ফেলা দরকার। ওঁরা আপনাকে জানিয়ে দিতে বলেছেন, দুই চারদিনের মধ্যেই মিটীং ডাকা হবে।"

মনে মনে কাজকর্মের হিসাব করিয়া কেয়া বলিল, "বেশ।"

গণেশ ও কেশরে নিবিড় সখ্যতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। গণেশ কেশরকে তাহার হাউসে নূতন চিত্র দেখিবার আমন্ত্রণ দিল।

সেদিন খাবার টেবিল আনন্দে ভরপুর—চম্পার পরীক্ষার পরে নিষ্কর্মা দিনগুলি সুখের প্লাবনে ভাসমান। বহুদিন পরে কেশর স্বচ্ছন্দে হাসিতেছে। অর্থ তাহার কাম্য। নিজের জন্য নয়, সুমিত্রার জন্য। জগতের কোথাও সে ঐশ্বর্য খুঁজিয়া পাইতেছে না, এমন সময়ে প্রতাপ ও গণেশের আবির্ভাব হইল। অতি সহজে রত্নময়ী কমলাকে তাহারা করগ্রাসের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে। কেশর সফলতা চোখের সামনে দেখিয়া সাফল্যের স্বপ্নে তন্ময়। চির বিষণ্ণ মুখে তাহার হাসি।

রাত্রের অন্ধকারে চম্পা আস্তে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, প্রতাপবাবু বিবাহিত, না?"

কেয়া একটু চিন্তা করিয়া উত্তর দিল, "একবার যেন তাই শুনেছিলাম। ঠিক বলতে পারবো না।"

চম্পা বলল, "ভারি চমৎকার লোক। ক'দিনেই কেমন আপন হয়ে গেছেন। ওঁর বন্ধুটিও বেশ। গণেশবাবু বেশী কথা বলেন না, খালি হাসেন। দুজনের বন্ধুত্ব দেখবার মত। দাদাও দিব্যি ওদের দলে ভিড়ে গেছে।"

দাদা গেলে ক্ষতি নাই, কিন্তু চম্পা তুমি যেও না। কেয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। প্রতাপকে দেখিলে চম্পা যেন হঠাৎ উদ্দাম হইয়া ওঠে। প্রতাপের রূপ, ব্যবহার, ঐশ্বর্য অনভিজ্ঞা রমণীর মন স্পর্শ করিয়াছে। প্রতাপ কেয়ার পূজারী, কিন্তু চম্পাকে দেখিলে তাহার চোখ উদ্দীপ্ত হইয়া ওঠে, কেয়া লক্ষ্য করিয়াছে।

নিরুত্তর কেয়াকে লক্ষ্য করিয়া চম্পা বলিতে লাগিল, "বাবা, বহুদিন পরে একটু হাসিগল্প হল বাড়ীতে। দাদা তো চিরকাল গোমড়া মুখ করে থাকে। তুমি কোনদিনই হৈ-হল্লা ভালবাস না। আমার দিনগুলো কাটে না আর। ক্লাসের বন্ধুরা সবাই দূরে দূরে থাকে। কি যে করি! তবু একটু কথা বলে বাঁচা যায়। দাদাও মনমরা হয়ে বাইরে বাইরে ঘোরে না।"

কেয়ার নিজের মনের সন্দেহ দমন করিল, অস্বস্তি বোধ করিল। দাদা, চম্পা যদি সুখী হয় তবে আসুক লক্ষ প্রতাপ, লক্ষ গণেশ। কেয়া আপত্তি করিবে না। স্বার্থপরের মত নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করিবে না। চম্পার দিনে হাসি আসুক, কেশরের দিনে আশা নামুক। আজ হইতে কেয়া সোম নিরস্ত হইল। আজ হইতে কেয়া সোম অস্বস্তির সঙ্গে আপোষ করিতে শিখিল। ভবিতব্যের বিরুদ্ধে আর কেয়া সংগ্রামী নয়।

তারপর কত সময় গেল—গণেশ-প্রতাপ ও প্রতাপ-গণেশ সঙ্কুল

দিন। ভ্রমণ, চিত্রগৃহ, আহার, উপহারে আকীর্ণ দীনগুলি। সহসা রাজকীয় দিনযাত্রার পরিধির মধ্যে কেয়ার দরিদ্র দিন গেল কোথায় ?

দুই একবার ব্যস্তভাবে সিনেমা কম্পানির অফিসে কেয়া যাতায়াত করিলেও অতীতের সাড়া পাইল না। অতীত আবার মূক হইয়া গিয়াছে বোধ হয়।

সেদিন সন্ধ্যা। কয়েকটি লিখিত গান হাতে কেয়া সোম গলিপথে প্রবেশ করিল। গ্র্যাণ্ড হোটেলে একটা পার্টি ছিল তার। সেখান হইতে এখানে আসিবার কথা। কিন্তু, কেয়া একটু আগেই আসিয়া পড়িয়াছে। তা হোক, আবার বাড়ী ফিরিয়া আসা যায় না এতদূরে। কেউ যদি নাই থাকে, কেয়া একাই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে।

আজ বাড়ীর কোণে কোণে অন্ধকার—বড় অন্ধকার। আগের দিন কেয়া প্রতাপের সঙ্গে গাড়ীতে আসিয়াছিল। জনারণ্য তখন। তার আগের দিন সকালবেলায় কেয়া আসিয়াছিল। মুখর অতীত তখন মূক ছিল। কেয়া ভাবিয়াছিল বোধ হয় প্রতাপ শেঠ সম্পর্কে তাহার অস্বস্তি যেমন স্তব্ধ হইয়াছে, এই বাড়ীটির অতীতও তেমনি নীরব হইল।

আজ চীনে শহরের বুকে জমাট বাঁধা রহস্য যেন আবার ভয়াবহ। বাড়ীর সিঁড়ির মুখে পদক্ষেপে কেয়ার গা ছমছম করিয়া উঠিল। যেন কেয়ার পাশে পাশে অদৃশ্য সত্তা চলিতেছে, পায়ে তার গুঞ্জরী পঞ্চম বাজে ক্ষীণ লয়ে।

তেতলার ছাদে আসিয়া কেয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বেয়ারা সনাতন গাছে জল দিতেছে। তিন চার মাসের মধ্যেই কাঠের বেড়ার গায়ে ফুলের টব ফুল বিলাইতে শিখিয়াছে।

সনাতন বিস্মিত হইয়া বলিল, "এখনও তো বাবুদের আসতে এক ঘণ্টা খানেক বাকী। আপনি কি বসবেন, না ঘুরে আবার আসবেন ?"

"আমি ঘরে বসছি। এককাপ চা দিতে বল।"

মেজেতে ফরাশের উপর ইতস্ততঃ তাকিয়া। চার পাশে কয়েকখানি সোফা—সেটি সাজানো। কেয়া দরজার বাইরে জুতা রাখিয়া কোণের তাকিয়া আশ্রয় করিল। পাখার বাতাসে ঘরের গ্রীষ্ম দূর হইলেও কেয়া আলো জ্বালিল না।

আবার নিদারুণ অস্বস্তি। একঘেয়ে রহস্যমাখা কোন বেদনার আভাসম্লান। সনাতন চায়ের তদারকে চলিয়া গিয়াছে। কে যেন ক্ষীণ-অস্পষ্ট কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল: কেয়া, কেয়া, কেয়া!

এ বাড়ীতে গল্প নাই? আবার ডুবিয়া মরিল কেয়া সোম। কেয়ার জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া অতীতের ছিন্ন পত্র আবার অনেকদিন পরে উড়িতে লাগিল।

ডায়েরীর পাতা

'সেদিন মা এলেন। আমার বিয়ের পরে এতদিনের মধ্যে মা মাত্র দু'তিন দিন এসেছেন। বাবা অবশ্য কয়েকদিন এসেছেন। কিন্তু, রোজ আমার সঙ্গে দেখা করেন নি। বাইরের বৈঠকখানায় বসে রূপোর গ্লাসে শরবত খেয়ে শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে গল্প করে আমার খবর নিয়ে চলে গেছেন। এসব বাড়ীতে কুটুমবাড়ীর সঙ্গে বিশেষ মেলামেশার রেওয়াজ নেই। তাছাড়া, শ্বশুরবাড়ী আমার বাপের বাড়ীর তুলনায় বেশী বড়লোক। মা-বাবা ঘন-ঘন যাতায়াত করতে চান না।

তাই মা এসেছেন শুনে মন আনন্দে ভরে গেল। তখন বেলা প্রায় দশটা। নিয়মমত ঠাকুরঘরে বসেছিলাম। ঠাকুরের পুজোর সাজ তৈরি হচ্ছে। নীল আর বাসন্তী চাদরে সল্‌মা-চুমকি বসাবার ভার আমার।

এতদিনে একটা মনের মত কাজ পেয়ে মাথা নীচু করে

সূচের মাথায় গুনে গুনে চুম্‌কি গাঁথছিলাম। স্কুলে কিছু সেলাই শিখেছিলাম। সেলাই করতে কষ্ট হ'ত না। এতদিন তো চোখের জলে ঠেকে ঠেকে পুজো-আচ্চার কাজকর্ম শিখেছিলাম। এখন আমার ওপর এক-আধটু সূক্ষ্ম কাজ দেওয়া হচ্ছে।

মা এসেছেন শুনে সেলাইয়ের কাঠের বাক্সে সমস্ত গুছিয়ে তুললাম। এতক্ষণে মা শাশুড়ীর ঘরের সামনে বসবার চাতালে বসে গল্প করছেন। শ্বশুরবাড়ীর কর্তা, বাড়ীর মাথা। শাশুড়ী সংসারের কাজ-কর্মে বড় একটা থাকেন না। তাঁর সমালোচনা কেউ করে না।

আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে তুললেও ওঠবার অনুমতি না পেয়ে উঠতে তো পারি না। মাথা নামিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। ছুটে গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরতে সাধ হচ্ছিল। কিন্তু লোহার গজাল দিয়ে এই ঠাকুরঘরের মেজের সঙ্গে কে যেন আমাকে গেঁথে রাখল।

কেউ কোন কথা বলে না। দূরে ঠাকুরভোগের ঘরে উড়েঠাকুর ডালে সম্বরা দিচ্ছে। তৈজসপত্রের ঘরে নারকেলের চন্দ্রপুলির বিরাট আয়োজন। সামনের ছাদে চালের গুঁড়ো কোটা হচ্ছে, আনন্দনাড়ু, খইচুরের যোগাড় হচ্ছে। আভাসে শুনছি পুজোয় এবার এদের কুলগুরু শিষ্যবাড়ী আসবেন। তাই পুজোর ঘরে এত ধুম। একতলায় ঠাকুরদালানে দুর্গাপ্রতিমা বসবেন। কিন্তু, বৈষ্ণব কুলগুরুর আস্তানা হবে উপরের দোতলায় রাধাকৃষ্ণের পাশে। তাই কাজের ভিড় এত ঠাকুরসেবাকে কেন্দ্র করে।

কুলগুরুর কথায় নাকি এঁরা ওঠ-বস করেন। নীচে মহা আড়ম্বরে মহামায়ার অর্চনা হ'লেও বলি নিষিদ্ধ—কুমড়ো-আখ খণ্ড-খণ্ড করে নিয়মরক্ষা হয়। গুরুদেব জীববলির বিধান দেন নি। যখন তিনি শিষ্যবাড়ী আসেন তখন দেবতার মতই তাঁর সেবা হয়। তাঁর দেশ যশোর অঞ্চলে। একপাল ন্যাড়া-নেড়ি নিয়ে

তিনি কদাচিৎ বহু আরাধনায় শিষ্যবাড়ী আসেন। নইলে চিঠি লিখে বা লোক পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকে যাবতীয় রাজ্যের বিধান আনা হয়। কখনও বা শিষ্যেরা প্রণাম করতে যান। বাঁধা বরাদ্দ বার্ষিকী আছে গুরুদেবের।

ধর্ম নিয়ে এঁদের তাণ্ডব দেখে মনে হয় ছোটকাকা দেখলে কতই না বিরক্ত হ'তেন। মেম বিয়ে করে আমার অমন কাকা পর হয়ে গেছেন, তাই না। নইলে, হয়তো এক আধদিন তিনি আসতেন। কি মজা হ'ত তাহলে!

ছোটকাকার কথা মনে হ'লে চোখে জল আসে। আমি গোপনে চোখের জল ফেলি। আমরা তাঁকে কত ভালবাসতাম। গোটা বাড়ীটি ওঁর কথার পেছনে চলত। এক বিদেশিনীর জন্য সবাইকে তিনি ছাড়লেন! আমাকে তিনি হয়তো ভুলেই গেছেন। আমি তাঁকে ভুলি কি করে? আমাকে যে তিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন। আমার মধ্যে এখনও তাঁর সত্তা জেগে ওঠে। পুতুলখেলার পুতুল আমি। আমার মনেও বিদ্রোহ জাগে।

আজও রাধাকৃষ্ণের মুখে হাসি—নিষ্ঠুর হাসি। আমি উঠে মায়ের কাছে যেতে পারছি না। আমাকে ঠাকুরের সেবাদাসী করা হয়েছে। সেবাদাসীর দুঃখে ঠাকুরের হাসি। কি করে পুতুলের প্রাণ থাকবে—পাথরে বানানো পুতুল মাত্র। এঁরা দেবতা করে তুলেছেন, তাই পুতুল পুজো পাচ্ছে। আসলে, এরা প্রাণহীন খেলনা মাত্র। আমি জানি ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।

ছোটকাকা রামমোহন রায়ের মতে মত দিয়েছিলেন। তাঁর ঘরে রাজা রামমোহনের বই থাকতো। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে পড়ে শোনাতেন। মা নিজের ঘরকন্না, রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। বাবা ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। ছোটকাকার শিক্ষায় আমিও পৌত্তলিক ধর্ম ঠাট্টার বস্তু মনে করতাম। গুরুবাদ আমি মানতাম না। স্কুলে সামান্য কিছু দিনই

পড়তে পারলেও স্কুলের শিক্ষা ও আবহাওয়া ছোটকাকার শিক্ষাকে সায় দিত—মায়ের ঘরে মা যখন গুন্‌গুন্ করে কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' পড়ছেন—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান,
কাশীরাম দাস ভনে' শুনে পুণ্যবান।"

তখন ছোটকাকার ঘরে ছোটকাকা পায়চারি করছেন আর মিলটন আবৃত্তি করছেন। আমি সেইখানেই যেতাম। না বুঝলেও ছোটকাকার ইংরাজি বলা ভাল লাগত। আচ্ছা, আমি মিলটনের নাম জানি শুনলে এঁরা অবাক হয়ে যাবেন, না? স্বামী কিন্তু নিশ্চয় খুশী হবেন। কত বড় বিদ্বান উনি!

মায়ের কাছে যেতে কেউ বলছে না। খবর নিয়ে তরু-ঝি ঠাকুরঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে এর-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। বেগতিক দেখে আমি পিসশাশুড়ীর পায়ের ওপর হাত রাখলাম। কি করব? সময় যে বয়ে যাচ্ছে।

পিসশাশুড়ী চম্‌কে উঠলেন, তারপরে বুঝে নিয়ে বললেন, "ও, তুমি বুঝি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবে, না? তা যাও না, তরু দাসী দাঁড়িয়ে আছে, ওর সঙ্গে যাও!"

খুড়শাশুড়ী সল্‌তের গোছা সরিয়ে তুড়ি দিয়ে আলস্য ভাঙলেন, "হরি, হরি! গুরু, গুরু, গুরু! বাবা, একালের বৌদের ভাগ্যি ভাল। হুট্-হুট্ করে বাপের বাড়ীর লোক আসছে। আমাদের কালে বছরে একবার বাপের বাড়ীর লোকের মুখ দেখতাম তো ঢের হ'ল।"

রামবাগানের কাকিমা বললেন, "আজকাল কি আর তোমাদের যুগ আছে গো? 'কালে কালে কতই হবে, পুলিপিঠের ন্যাজ গজাবে'।"

খুড়শাশুড়ী আদেশ দিলেন, "আর যা কর বাছা, পুজোর কাপড়ে ধেই ধেই করে মায়ের কাছে হাজির হোয়ো না। ও তরু,

মণিবৌমার হাত-মুখ ভিজে গামছায় মুছিয়ে একখানি জামদানী ঢাকাই পরিয়ে দে। জড়োয়া সিঁথিটাও পরিয়ে দিস।"

আমার হাসি পেল। পুজোর কাজ ঠিকমত পারি না বলে লাঞ্ছনা শুনতে হয়, বয়েসের খোঁটা খেতে হয়। কিন্তু, এত বয়সে চুলটি পর্যন্ত নিজে বাঁধবার হুকুম নেই, দাসী কাপড় জামা পাল্টে দেয়। বনেদী বাড়ীর রীতি বিচিত্র।

রীতিমত সাজ-পোশাক করে তবে মায়ের সম্মুখে যাবার হুকুম পেলাম।

শাশুড়ীর বসবার জায়গাটি সুসজ্জিত। মাঝে মাঝে নিকট-আত্মীয়ের সঙ্গে শ্বশুর এক-আধবার বসেন কি না। আগাগোড়া দামী কার্পেট ঢাকা। মেহগিনীর আসবাব। সোফা-চেয়ারগুলো লাল মখমলে মোড়া, সোনালী পাড় আঁকা। মার্বেলের টেবলে ফুলের তোড়া। বেলওয়ারি ঝাড়ের নীচে মা বসে আছেন। সামনে আসন পাতা, রুপোর রেকাবে জলখাবার, রুপোর গ্লাসে জল, সোনার কাজকরা রুপোর ডিবায় পান-মসলা। মাথা লাজুক ভাবে নামিয়ে মা একটু হাসছেন। শাশুড়ীর ফ্যাকাশে মুখে একটু লালের আভা লেগেছে। হাত নেড়ে তিনিও গল্প করছেন।

শাশুড়ীর মন দু'দিন হ'ল ভাল। সাদা ঘোড়ার জুড়ি থেকে মত্ত অবস্থায় নামতে যেয়ে শ্বশুর কালপেড়ে ধুতির কোঁচায় পা বেধে পড়ে পা ভেঙ্গেছেন। ইংরেজ ডাক্তার চিকিৎসা করছে, বাড়ীর মধ্যে আটকে আছেন, বাগানবাড়ীতে বা'র হ'তে পারছেন না। অতিকষ্টে সন্ধ্যার পর একটু বৈঠকখানায় নামেন। গান-বাজনা একেবারে বন্ধ। তাই শাশুড়ী খুশী, শ্বশুরের কাছে ঘোরাফেরা করেন।

মা বলছেন, "না, না আমি খেতে পারব না, বেয়ানঠাকরুন। রোজই আপনি সাজিয়ে দেন। কিন্তু, নাতির মুখ না দেখলে এখানে কিছু খেতে পারিনে। একটা পান নিচ্ছি।"

মা মিঠে পানের খিলি তুলে নিলেন। শাশুড়ী হেসে বললেন,

"তা, বেয়ানঠাকরুন, আর নাতির জন্য বেশীদিন হেদিয়ে মরতে হবে না। পুজোর পরে আপনার জামাই বাড়ী ফিরছে। এ জলখাবারটা, মণিবৌমা, তুমি খেয়ে ফেল।"

স্বামী ফিরছেন শুনে মন খুশীতে ভরে গেল। সকালে একবাটি দুধ, ছানার মালপোয়া খেয়ে খাবার নামে গা গুলিয়ে উঠল। আমাকে কাজকর্ম শেখাবার ভার অন্যের ওপর থাকলেও খাওয়া-দাওয়াটা শাশুড়ী দেখতেন। আমি ছিপ্ছিপে ছিলাম, শাশুড়ী আমাকে রাতারাতি ফুলিয়ে একটি পাশ বালিশ করবার জন্য ব্যস্ত।

আমার অনিচ্ছা দেখে মা তাড়াতাড়ি বললেন, "যাক গে, খাবার না হয় পরেই খাবে। আমার সঙ্গে দু'টো কথা বলবার হুকুম দিন। কবে আবার দেখা হ'বে। এতদূরে যাচ্ছি। ফিরি কি না ফিরি।"

আমার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। মা কোথায় যাচ্ছেন? শাশুড়ী বললেন, "বালাই ষাট। তীর্থদর্শন ভাগ্যে থাকলে তবে হয়। ভাগ্যিমানী মানুষ আপনি। তা, মণিবৌমা, তুমি বাছা মায়ের কাছে বসে গল্প কর। আমি ওনার ঘরে যাই। অসুখী মানুষটা পড়ে আছে। কি লাগে না লাগে। তরু, তুই খাজাঞ্চিখানায় খবর নে, গুরুঠাকুরের বালিশের কিংখাব এল নাকি।"

নির্জন হওয়ামাত্র মাথার কাপড় তুলে জিজ্ঞাসা করলাম, "মা, তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

মায়ের হাসি নিভে গেল, চাপাগলায় বললেন, "তোমার কাকা বিলেত চলে গেছেন মেম নিয়ে। এনাদের কানে এখনও পৌঁছেনি। তোমার বাবা মনের দুঃখে তীর্থ করতে চলেছেন। ছয় মাসের মত সময় ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন। আমি সঙ্গে চলেছি। ছেলেরা খুলনায় মামার বাড়ী ছয়মাস থাকবে।"

মা-বাবা গেলে আমার কে থাকবে? কাকাও বিলাতে গেলেন।

ভাইয়েরা কতদূরে পাড়াগাঁয়ে থাকবে। জীবনে মাত্র দু'তিনবার মামার বাড়ীর দেশ দেখেছি আমি। অসহায় বোধ করলাম।

মা বললেন, "তোমার কাকা শেষ-দেখা করতে এসেছিলেন। তোমার জন্য কতকগুলো জিনিসপত্র দিয়ে গেছেন। এখানে পাঠাতে সাহস হ'ল না।"

কাকা এখনও আমাকে ভোলেন নি 'তাহ'লে? কিন্তু, আর কি কাকার সঙ্গে জীবনে দেখা হ'বে! আমাকে ছেড়ে একে একে সবাই চলে যাচ্ছেন। চোখে জল এল।

মা আমাকে কাছে টেনে নিয়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "কষ্ট কি মা? ছয় মাস পরেই ফিরে আসব। তুমি এখানে সুখে থাক। ক'দিন পরে জামাই এসে যাচ্ছেন। এই ধরো।"

খালিহাতে মা আমাকে দেখতে আসেন না, হাতে দিলেন একজোড়া মুক্তোর ফুলঝুমকা। আমি কি করে মাকে বোঝাব যে এই বাড়ীতে আমি কতটা বেমানান, এখানে আমার কেউ নেই! কি করে বোঝাব যে আমি ভয়ে লজ্জায় মুখ তুলতে পারি না! কি যেন বিভীষিকা আমাকে ঘিরে ধরতে আসছে। কেউ যদি আমার কাছে না থাকে, আমি কি করবো!

সন্ধ্যা বেলায় বাবা এলেন। আগামী পরশু তাঁরা যাত্রা করছেন, তাই শ্বশুরমহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে আমাকে দেখে গেলেন। বারান্দায় চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম বাবা গাড়ীতে উঠলেন। নীচের ফটকে কত আলো, কিন্তু বড় বড় থাম-দেওয়া বারান্দায় অন্ধকার।

বাবা বেরিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোরের 'মত একজন চীনে এসে ঢুকল। আধাবয়সী কুৎসিৎ চেহারা। তরু-ঝি আপন মনে বলল, "ওমা, লি-পো আজ এত সকালে?"

চাপা গলায় ঘোমটার মধ্য থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওর নাম লি-পো বুঝি ?"

"হ্যাঁগো, ভারী চালাক-চতুর লোক ও। ভাল বাংলা জানে। বাড়ীর কত কাজকর্ম করে দেয়। চুপিচুপি কাজ গুছিয়ে দিতে ওস্তাদ ও। এধারে দর্জির দোকান আছে গলিটার মধ্যে। তোমার বৌভাতে নেমন্তন্ন খেয়ে গেছে।"

বড়জা আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, "ও মণিবৌ, কেমন পাখী বুনেছি, দেখবি আয় !"

শিকলে বাঁধা খাঁচার পাখী আমি পশমের পাখী দেখতে চললাম। ৪ঠা আশ্বিন

"চা এনেছি। বড় দেরি হয়ে গেল মা। ক্যান্‌টিনের লোকেরা বাজার করতে গিয়েছিল।" সনাতন কেয়ার সম্মুখে চা রাখিল।

কেয়া সোমের মনের মধ্যে চমকিয়া উঠিল। একটু পূর্বেই না তাহার অজানিতে তাহার আত্মা চলিয়া গিয়াছিল কোথায় যেন ? এই বাড়ীর গহন গভীর নীরবতার কূপে আধুনিকীর সত্তা ডুবুরীর মত কোন গোপন সম্পদ খুঁজিয়া মরিতেছে ? তাহার নির্নিমেষ চক্ষুর সম্মুখে কাহার দিনপঞ্জীর ছিন্নপত্র এতক্ষণ ধরিয়া উড়িতেছিল ?

স্বপ্নের মত প্রহর কাটিল। যাহাদের আসিবার কথা যথাসময়ে তাহারা আসিল। মিটিং হইল, রেসোলিউশন্ পাশ হইল। স্বপ্নাতুরার মত কেয়া চোখ মেলিয়া শুধু দেখিল। সিনেমার গল্প দিয়া কেয়ার প্রয়োজন নাই। কেয়া প্রকৃত জীবনের গল্পের সন্ধান পাইয়াছে। এতদিনে কেয়া সোম কাহিনীর সূত্র ধরিতে পারিল।

আজ প্রতাপ আসে নাই। ট্রামে কেয়া বাড়ী ফিরিল। খাওয়া-দাওয়া মিটিয়া গিয়াছে ততক্ষণ। কাঠের টেবলে কেয়ার খাবার আগলাইয়া ফ্যাল্যা বসিয়া আছে।

ফ্যাল্যা খবর দিল, “আজ তুইডা মাছ আছে আপনার লগে। ছোটদিদিমণি খাইবেন না।”

কোন বন্ধুর ওখানে হয়তো চম্পা খাইয়া-আসিয়াছে। কেয়া অন্যমনস্কভাবে আহার শেষ করিল।

কেয়ার শোবার ঘরে চম্পার খাট শূন্য। অবশ্য কেয়া শয়নের উদ্যোগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে চম্পা কেশরের ঘর হইতে আসিল।

উদ্দীপ্ত মুখচ্ছবি দিদির দিক হইতে ফিরাইয়া চম্পা বলিল, “উঃ, আশ্বিনের প্রথমে কি গুমোট!”

চম্পা আজ বাড়ীতে খায় নাই, এ কথা কেয়াকে সে বলিল না। কেয়া চিন্তিত হইল।

কিছুদিন হইতে চম্পা গোপনতা আশ্রয় করিয়াছে। সেই সরলা কিশোরীর সারল্য আর নাই। কেশরের সঙ্গে চুপিচুপি কথা কেয়াকে দেখিলে থামিয়া যায়। কেয়াকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টায় প্রতিপদে ধরা পড়ে। নির্জনে কি যেন ভাবে নিজের মনে।

কেশরের সঙ্গে কেয়ার নিবিড় সখ্যতায় ছেদ পড়িয়াছে; চম্পার সঙ্গে বরঞ্চ কেশরের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়াছে। কেয়া ভাবে, পরীক্ষার পরে কর্মবিহীন চম্পা দাদার স্নেহে ভাগ বসায়। কেয়া ব্যস্ত, তাই কেশর চম্পার সঙ্গে নিজের জীবনের সমস্যা আলোচনা করে।

কি তাহারা গোপন করিতে চায় কেয়ার কাছে? কোন্ জটিলতার জাল তাহাদের বেষ্টন করিয়া ধরিল? সামান্য সাদা জীবনের কথা তাহাদের কূটস্থ মন্ত্র নয়। কথাটা কি? কথাটা কি?

আজ কেয়ার স্বপ্নে দেখা দিল সুন্দরী সুমিত্রা। আধ অন্ধকারে বাঘের চামড়ায় তনুশ্রী আবৃত করিয়া লম্বা হোল্ডারে সিগারেট ধরিয়া আছে। ডানহাতে চামড়ার শিকলে বাঁধা কেশর—চার হাত পায়ে জন্তুর প্রথায় পায়ের কাছে বসিয়া আছে। লম্বা একটি ল্যাজ গজাইয়াছে কেশরের। সেই ল্যাজ সে আন্দোলিত করিতেছে।

সুমিত্রার সিগারেটের আগুন যেন মশাল। বামদিকে চম্পার গায়ে আগুন ধরিয়া গেল। ওঃ, চম্পা যে পুড়িয়া মরিল।

এই নৃশংস পটভূমিকায় সুমিত্রা চন্দের মধুর হাসি ফুলের মত ঝরিয়া পড়িতেছে।

সন্ধ্যায় সজ্জা করিল কেয়া। চম্পা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ? আজকাল রোজ বার হও দেখছি।"

প্রয়োজন না থাকলেও কেয়াকে বাহির হইতে হইবে। যে বাড়ী হইতে দূরে থাকিতে হইত, সেখানে কেয়া সোম নিত্য ছুটিয়া যায়। অতীত তাহাকে ধরা দিয়াছে, ধরা নিজে দিয়া কেয়াকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। সে বন্ধন অচ্ছেদ্য।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চম্পার মুখে চাহিয়া কেয়া উত্তর দিল, "যাচ্ছি, সিনেমা কম্পানির সেই অফিস বাড়ীটায়।"

"কেন? এখন তো মিটিং বসে না। কেউ তো আজকাল যায় না। শুটিং শুরু হবার আগে সবাই আবার যাবে। প্রতাপবাবু বলছিলেন—" হঠাৎ চম্পা চুপ করিয়া গেল।

সেই রকম দৃষ্টিতে চম্পার দিকে চাহিয়া কেয়া বলিল, "জানি প্রতাপবাবু আজকাল যান না। তোমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো হয়। গণেশবাবুর বাড়ীতে তুমি আর দাদা ওঠো। আমাকে না বল্লেও সমস্ত জানি।"

চম্পার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। একটুক্ষণ সে মাথা নামাইয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপরে সতেজে উত্তর দিল, "তাতে কি হয়েছে? বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে লোকে বেড়ায় না? দাদা তো সঙ্গে থাকে?"

"পরশুদিন কোন্ দাদা তোমার সঙ্গে ছিল, যখন একা গণেশের বাড়ীতে গঙ্গার ধারে যাচ্ছিলে?"

"ও, গঙ্গার ধারে গণেশবাবু একটা পুরনো জাহাজ দেখাতে গিয়েছিলেন। প্রতাপবাবু আর গণেশবাবু দু'জেনে মিলে একটা জাহাজ কিনছেন। নামটা ভারী মজার দিয়েছেন, পিঙ্কি।"

"আসল কথার উত্তর দিচ্ছ না, চম্পা। একা ছিলে কেন?"

"বা রে, দাদা যে সুমিত্রাদির ওখানে গেল। প্রতাপবাবুর দরকারী কাজ ছিল, উনি পথে নেমে গেলেন।"

"আর তুমি একা গণেশ শেঠমলের সঙ্গে বেড়ালে? বেশ, বেশ।"

"তোমার মন বড় ছোট, দিদি। ওঁরা কেমন ভদ্রলোক, আমাদের সকলকে কত ভালবাসেন।"

"আগে ভেবেছিলাম তোমার বোধহয় পক্ষপাত প্রতাপ শেঠের দিকে।"

"ছি, দিদি। প্রতাপবাবু বন্ধু কি খারাপ হতে পারেন?"

"তাহ'লে দেখা যাচ্ছে প্রতাপবাবু তোমার বিশ্বাস, সরলতার সুযোগ নিয়ে গণেশের দিকে তোমাকে ঠেলে দিচ্ছেন।"

চম্পা বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া বলিল, "তোমার কি হয়েছে, দিদি? এমন অভদ্র কথা বলছ?"

"কেন বলছি আমি, জানি। আজও নিশ্চয় একা একা যাওয়া হবে? দাদা সুমিত্রার সঙ্গে সিনেমায় গেছে, জানি।" কেয়ার দৃষ্টিতে চম্পার কেশ ও নখর প্রসাধনের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছিল।

"তোমার কাছে লুকোব না, দিদি। আমাকে যেতেই হ'বে।"

"চম্পা!"

"আজ নিষেধ করো না। শুধু আজকের দিনটা। তোমার কাছে দাদা আর আমি সত্যই কিছু গোপন করেছি। পরে সমস্ত খুলে বলব। এখন, লক্ষ্মীটি, শুনতে চেও না। তোমাকে আমরা বেজায় ভয় পাই। তুমি বড় বেশী কড়া।"

"তুমি সর্বনাশে যাবে যাও। এ তোমার ভবিতব্য। তোমাকে বাধা দেওয়ার শক্তি আমার নেই।"

চম্পা নিঃশব্দে চলিয়া গেল। কেয়া পথে নামিল।

না, অতীত আর মৌন নয়, মূক নয়। অতীত কথা বলে।

একা বাড়ীর অন্ধকারে কেয়া সোম সেই কথায় গল্প রচনা করে। দূরে থাকার উপায় নাই কেয়ার। নিষ্করুণ টানে বাড়ীটি তাহাকে টানে। সেখানে যাওয়া কেয়ার নেশা। কেয়ার সাবধানী মন ভীতি শঙ্কা বিস্মৃত হইয়াছে। কেয়া সে গল্পের সূত্র পাইয়াছে।

চম্পার ধ্বংস অনিবার্য। কেয়ার কাছে কিছুই আর অস্পষ্ট নয়। যুগ যুগ ধরিয়া তিনটি শতাব্দী ব্যাপিয়া জীবনের গভীর বিয়োগান্ত নাটক বারবার অভিনীত হইতেছে। তাহার শেষ নাই। সময়ের মত অশেষ সে সময়ের হাতের তাস।

একই ব্যথিত সত্তা যুগে যুগে অতৃপ্ত বাসনার তীরে জন্মগ্রহণ করিতেছে। তাহার ভাগ্য সে অতিক্রম করিতে চায় জন্মান্তরে। ভাগ্যের ক্রূরতা এক শতাব্দীর অন্তে কিছু ক্ষীণ হইলেও অমোঘ অদৃষ্টের বিধানে স্থায়ী।

সেই ব্যথিত সত্তা পরশতাব্দীতে আবার জন্মগ্রহণ করিল। তাহার সাধনা ভাগ্যকে অতিক্রম করিয়া প্রিয়ের সঙ্গে যুগ্ম জীবন যাপন করা। তাহার সাধনা বিদেশীর স্পর্শ হইতে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করা।

সাধনা কিঞ্চিৎ সিদ্ধি আনে। সমগ্রভাবে ভাগ্যকে অতিক্রম করার সাধ্য স্বয়ং ধাতারও নাই। তিনিও ভাগ্যচক্রের দাস।

জন্মান্তরে অভিশাপের তীব্রতা হ্রাস হয় মাত্র, সম্পূর্ণ বিষ অমৃত হয় না, মুখোপাধ্যায় বাড়ীর বৌ মণিমালা রূপে জন্মান্তের ব্যথিত সত্তা আবার দেখা দিল। আবার সে বিধাতার কাছে সার্থকতার বর চাহিয়া সাধনা করিল, আবার সে নিষ্ফলতা হইতে মুক্তি চাহিল।

এবার চীন দেশের বিদেশী, এবারেও সে প্রিয়বিহীনা। জন্মান্তরের মদনমোহন এবারও তাহাকে বঞ্চনা করিলেন। কিন্তু হয়তো চৈনিক কবল হইতে সে পলায়ন করিয়াছিল এই জন্মে— হয়তো গঙ্গার জলে তাহার অবসান হইয়াছিল।

সেই ব্যথিত নিঃসঙ্গ সত্তা কেয়া চম্পার মধ্যে নিজেকে নবজন্মে ভাগ করিয়া দিয়াছে। এবারে তার ভাগ্যে কি আছে? জন্মান্তের

অভিসম্পাত কি এবারেও তাহাদের ধ্বংস করিবে? বিদেশীর লোভের হাতে এবারেও বাংলার সম্পদ অপমানিত হইবে?

ট্রামের গদিতে শিথিল কবরী রক্ষা করিয়া কেয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। আদ্যন্ত জানে কেয়া সোম। ভবিষ্যৎ অতীতের ভূমিকায় তাহার চোখের সামনে উন্মোচিত।

মুখোপাধ্যায় বাড়ীর মণি বৌ-এর মত' কেয়ারও শেষ আসন্ন। তাহাদের কাহারও রক্ষা নাই। মণি বৌ-এর কাহিনী শুধু ভাল করিয়া শুনিতে চায় কেয়া সোম।

বাংলার মেয়ের মুক্তি নাই। জব চার্ণকের আত্মা কলিকাতার শিয়রে প্রহরা দিতেছে। বহু পূর্বে জ্বলন্ত অগ্নিতে যে নারী 'সতী' হইয়াছে, যে নারী জব চার্ণকের শয্যাসঙ্গিনী হইতে বাধ্য হইয়াছে, সেই নারী মহানগরীর বুকে বার বার ব্যর্থ তৃষিত জন্ম গ্রহণ করিয়া মরিতেছে। অদৃষ্ট চক্রকে কিসের দ্বারা অতিক্রম করা যায়?

সনাতন বেহারা সবিনয়ে জানাইল, "আজও তো বাবুরা কেউ আসবেন না। আপনি শুধোশুধি ক'দিন একা বসে ফিরে গেলেন।"

কেয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিল, "আমি জানি কেউ ওঁরা আসবেন না। আমি একা বসবার জন্যেই আসি।"

সনাতনের বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া কেয়া বলিল, "এখানে নিরিবিলি বসে লিখবার জন্যে আসি। তোমাকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। তুমি নিজের কজে যাও। শুধু ক্যান্টিনে বলে দাও আমাকে পুরো এক পট চা পাঠাতে।"

নির্জন ঘরে কেয়া সোম একা বসিল। কাগজপত্র খুলিয়া কলমের আঁচড় কাটিতে কাটিতে ভাবিল, আজ অতীতের শেষ কথা সে শুনিয়া যাইবে। অতীত যুগে যুগে একাই ইতিহাসের জের টানে। কেয়া সোম আর জের টানিবে না।

সনাতন চা রাখিয়া গেল। এবার কেয়া সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। এবারে

অতীতের আত্মার সঙ্গে মুখোমুখী কেয়া সোম। কখনও দিনপঞ্জীর পাতায়, কখন চোখের সম্মুখে মুখুজ্জেবাড়ীর সম্পূর্ণ গল্প ভাসিয়া উঠিল। অতীত আর অস্পষ্ট নয়।

গান বাজিয়া উঠিল অতীতের নিশ্ছিদ্র শিলাতল হইতে—

নমো নমো গুরুবে নম,
পাপতাপহরণ ;
জীবদেহে ধন্য, দেব :—
লহ লহ শরণ।

বিরাট পুরুষালী গলার তারস্বরে চীৎকার। উলুধ্বনি, শঙ্খ, খোল, করতাল। ঠাকুরঘরে ঠাকুরের পাশে উচ্চ রেশম মোড়া গদিতে কুলগুরু গোঁসাইজী সমাসীন। নিগূঢ় তন্ত্রের গোপনীয় সমস্ত ধর্মপ্রথা এই বংশের অস্থিমজ্জায় মিশ্রিত। গোপনে থাকে গোপনীয় অন্ধকারে আবৃত হইয়া। একদা উত্থিত হইয়া সভ্যজগতে ভীতির উদ্রেক করে।

গোঁসাইজীর স্থূলদেহে পট্টবস্ত্র, মাথা নেড়া, একটি বৃহৎ শিখা দোদুল্যমান, গায়ে হরিনাম লেখা, নাকে তিলক। নাকি সুরে মন্তপের ঢংএ কথা বলেন গোঁসাইজী। দীর্ঘকাল পরে শিষ্যবাড়ী বিশেষ প্রয়োজনীয় আহ্বানে আসিয়াছেন। শিষ্যবাড়ী ধন্য হইয়াছে।

আহা, এই নূতন বধূটির অত মুখ শুষ্ক কেন ? ষোড়শী, সবে বিবাহ হইয়াছে, স্বামীর সহিত এখনও বাস করে নাই। দেহমনে কুমারী সে। স্বামী ছাত্রাবাসে থাকিয়া বি-এ পরীক্ষার পড়া করিতেছে। ভারী বিদ্বান কিশোর, বংশের মধ্যে সেই প্রথম পরীক্ষা দিতেছে। পরীক্ষা শেষ হইলে পূজার পরে গৃহে বধূর সঙ্গে বাস করিতে আসিবে। কিন্তু তাহার পূর্বে যে গোঁসাইজী আসিয়াছেন।

শুষ্ক-করুণ মুখ কমনীয়া বধূর। গুরুদেবের বিরাট বপুর দিকে সে সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। লক্ষ্য করিয়া নাকিসুরে গোঁসাইজী ঘাড় হেলাইয়া বলিলেন, "লজ্জা কি গো ? আমি কি বাঘ, না ভাল্লুক ?"

গুরুদেবের রসিকতায় ঘরসুদ্ধ লোকও তাঁহার সহিত আগত ন্যাড়া-নেড়ীর দল হাসিয়া উঠিল। বধূ শিহরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কেন? কেন? কি রহস্য কয়েকদিন হইল বাড়ীর আনাচে-কানাচে নববধূটিকে কেন্দ্র করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে? কেন গোঁসাইজীর আগমনে ভীতি-ব্যাকুলতা নূতন বধূর বক্ষে? কেন তাহাকে স্বামী-সহবাসে অনুমতি দেওয়া হয় নাই?

গুরুপ্রসাদী! সমগ্র গৃহ যেন চীৎকার করিয়া ওঠে, 'না, না! ধর্মের নামে এতবড় অনাচার আমরা সহ্য করিব না। অত্যাচারের সীমা আছে।'

পতিসহবাসের পূর্বে অনাঘ্রাতা কুমারীকে প্রসাদ করিয়া দিবেন স্বয়ং গুরু। হেয় ঘৃণ্য-প্রথা গোপনে গোপনে গাঙ্গুলী বাড়ীর অন্ধকারে ডুবিয়াছিল। পরিবারের বহু ব্যক্তি জানিত না পর্যন্ত। ঘৃণ্য প্রথা এমন করিয়া ধর্মান্ধ গাঙ্গুলী বাড়ীর আনাচে-কানাচে লুকাইয়া আছে যে, তাহাকে কর্তৃপক্ষীয়েরা কখনও অতিক্রম করিতে পারেন নাই। হয়তো চেষ্টারও অভাব ছিল। আরশোলা যেমন মাকড়সার গ্রাসে পড়িয়া কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া অবশেষে নির্জীব হইয়া মরে, মানুষের প্রতি-ক্রিয়াশীল রক্তও সেইরূপ অস্থিরতার পরে বৈষ্ণবীয় ধর্মের নিশ্চেষ্টতায় মৃত হইয়া আছে। পুরাতন সমাজের উপহার অন্ধ ধর্মবিকৃতি—গুরুপ্রসাদী।

মণিমালা আধুনিক শিক্ষায় মানুষ। এমন বীভৎস ব্যাপারের অভ্যাসও জানিত না। মাতাপিতা বিদেশে চলিয়া গিয়াছেন। হাতের কাছে স্বামী ছাড়া কেহ নাই। আগামীকল্য রাখি-পূর্ণিমার রাত্রে গুরুপ্রসাদী হইবে। কি সে করিতে পারে?

গোঁসাইজীর স্থূল বপু, হায়েনার মত হাসি স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিল মণিমালা। কুমারীর কৌমার্য উপহার? একনিষ্ঠ প্রেমিকাকে নয়, মন্ত্রবদ্ধ স্বামীকে নয়। একদা বিদ্রোহী বাংলা উচ্ছৃঙ্খলতাকে সমর্থন করিতে যে ধর্মবিধির আশ্রয় লইয়াছিল, সেই ধর্মবিধির কুৎসিত

আচার ফুলের মত পবিত্রা নারীকেও নির্বিচারে মানিয়া লইতে হইবে ?

দিনপঞ্জীর ছিন্নপত্রে

"হা ভগবান! আমার কি হবে? দুই দিনের মধ্যে কি করব? বাড়ীর কারুর সঙ্গে কথা বলা যায় না। ঝি-এরা আমার পাহারাদার। স্বামীর ঠিকানা জানি। চিঠি লিখে রেখেছি; কিন্তু ডাকে দেব কাকে দিয়ে? ডাকে দিলেও কি ঠিক সময়ে পাবেন?

মা বাবাকেও চিঠি লিখে রেখেছি। কি করব? কাল রাত্রে আবার স্বপ্ন দেখেছি; পুরনো স্বপ্নখানাই। কালো প্রকাণ্ড বাঘ, মানুষের মত। আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছে তার কাল কাল হাতের নখ।

আর ভাবতে পারি না। আর কিছু না হলে মরতে তো পারবো; কিন্তু বিষ কে এনে দেবে? কোন অস্ত্রও তো নেই কাছে।"

হাল্কা শরীর লইয়া হাল্কা পায়ে দর্জি চলিয়া যাইতেছিল। গোঁসাইজীর কীর্তনের রবে সারা বাড়ী সচকিত। ঠাকুরঘরে সাদা মার্বেলে আলিম্পনা ও পুষ্পশোভা। বাড়ীর সকলেই সেখানে উপস্থিত। আগামীকাল শুভ পূর্ণিমা। স্বয়ং কর্তা দশা পাইয়াছেন। পরিজন পরিবারবর্গ শশব্যস্ত।

ছায়ার মত চীনা সিঁড়ির পাশের গলি দিয়া খিড়কীর দরজার দিকে চলিল, কর্তার মন্ত্রণা ঘর একতলায় উঠানের পাশে। অন্ধকার বিদ্যুৎ-বিহীন বাড়ী থমথম করিতেছে। একটি ঝোলানো কেরোসিনের চৌকো বাতির আভায় গলির পথ আলো হয় নাই।

লি-পো পুরাতন লোক, কর্তার গোপন আফিম চালাই ব্যবসার ম্যানেজার। যখন তখন অবাধগতি তার অব্যাহত। লোকে জানে মুখুজ্জে কর্তা লগ্নি কারবারে পয়সা-কড়ি ধার দেন। তাই চীনা-পাড়ার মধ্যে প্রত্যেক চীনার তাঁর সঙ্গে জানাশোনা। কিন্তু, প্রকৃত ব্যবসায় তাঁর কোকেন ও আফিমের চোরা বাজার। চীনারা তাঁর অস্ত্র।

ছায়ার পাশে চকিতে আর একটি ছায়া আসিল। সাদা মৃণালের সমান দুইখানি কচি-কচি লাল শাঁখা পরা হাত বের হল। একখানি চিঠি চীনা হাত পাতিয়া লইল। চকিতে সে গতিপথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

গজদন্ত-খচিত পর্যাঙ্কে সুখশয্যা লাল কিংখাবের বালিশ, চিতার আগুন যেন। টানা পাখা দ্রুত চলিতেছে। গোঁসাইজীর বেনারসীর ধূপছায়া রংএর জোড়। যুঁই ফুলের গোড়ে মালা, চন্দনের পত্রলেখার সাজে নববর সাজিয়া পর্যাঙ্কে শয়ন করিয়াছেন। মণিমালাকে নূতন বস্ত্র ও অলঙ্কারে সাজানো হইয়াছে। চারিপাশে বাড়ীর মেয়েরা আড়ি পাতিবার উদ্দেশে প্রস্তুত। দরজার বাহিরে ন্যাড়া-নেড়ীর দল খোল করতাল লইয়া অপেক্ষমান। মণিমালার চাপা কান্না ও অবরোধ অগ্রাহ্য করিয়া ধাক্কা দিয়া তাহাকে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করাইল। ওই শয্যায় তাহাকে উপভোগ করিয়া কুলগুরু প্রসাদ করিয়া দিবেন। তারপরে সেই শয্যায় স্বামী তাহাকে পাইবে। বংশপরম্পরানুগত ধর্মের গতি এই।

গোঁসাইজী লোলুপ দৃষ্টিতে নবোঢ়ার রূপলাবণ্য পান করিয়া চিত্তবৃত্তির প্রাবল্যে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে বাহিরে খোল-করতাল ও হরিনাম শুরু হইয়া গেল। মেয়েরা হাতজোড় করিয়া প্রণামান্তে সরিয়া গেল। পাখাকুলি ঝট্‌পট্‌ শব্দে পাখা দ্বিগুণ বেগে চালাইল। ঘরের মেজের উজ্জ্বল মোমবাতিটি গোঁসাইজী ফুৎকারে নির্বাপিত করিয়া ফেলিলেন। বাগানের দিক হইতে জানালার পথে ঈষৎ জ্যোৎস্না দেখা দিল।

আশঙ্কায় স্পন্দিত অন্ধকারে মণিমালার ভীতিস্তম্ভিত শ্রবণে লম্পটের আশ্বাসবাণী শোনা গেল, লালসামত্ত চোখের ক্রূর দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল। কাঁপা, উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে গোঁসাইজী বলিতে লাগিলেন, "এস এস রাধা আমার। লজ্জা কি, ভয় কি? আমি যে তোমারি শ্যাম।"

গোঁসাইজীর কণ্ঠ অকস্মাৎ রুদ্ধ হইল। সবল কালো কাপড়ে ঢাকা একখানা হাত পূজ্যপাদের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। শ্যামের আ—মুখে থাকিতেই তিনি শয্যায় ঢলিয়া পড়িলেন। মণিমালা অস্ফুট চীৎকার করিয়া দুইহাতে মুখ ঢাকা দিল।

গোঁসাইজীর দেহ স্তব্ধ হইলেও কালো পোশাকধারীর আক্রমণের বিরতি নাই, জ্ঞানহারা ব্যক্তির কণ্ঠনালী সে ক্রমাগত পিষ্ট করিতেছে দারুণ আক্রোশে। হত্যাই যেন বিলাস তার। প্রয়োজন মিটিয়া গেলেও হত্যা যেন তাহার ধর্ম।

মৃতকে ছাড়িয়া ছায়ামূর্তি মণিমালার কাছে সরিয়া আসিল, খাটের পশ্চাতে অঙ্গুলি দেখাইল, অনুসরণ করিতে বলিল। খাটের পেছনে মেজের একটি স্থান সরিয়া গিয়াছে, সরু চোরা সিঁড়ি দেখা যাইতেছে, ত্রিতল হইতে সোজা বড় সিঁড়ির চাতালে একতলায়।

মণিমালা সুড়ঙ্গের পথে পায়ে পায়ে নামিতেছে। তাহার ত্রাতা আসিয়াছে। মুক্তি দাতা স্বামী তাহার। আর ভয় কি? খোল করতালের উল্লাস থামিবার পূর্বেই এ বাড়ীর পাকচক্র হইতে রাজপথে নামিয়া যাইবে দু'জনে। তারপরে, সারা পৃথিবী তো খোলাই আছে।

তবু অন্ধকারে নির্বাক কালো মূর্তির পাশে চলিতে মণিমালার বুক কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। সরু সিঁড়ি, গায়ে গা লাগিয়া যাইতেছে। বিবাহের পরিচিত স্পর্শ কি?

ইতিপূর্বে স্বামীর ভয়াবহ মূর্তি দেখিয়াছে মণিমালা, তাহাতে কথা বলিবার সাহস নাই, তবু রুদ্ধ মৃদুস্বরে প্রথম কথা সেই বলিল, "তুমি এসেছ?" নির্বাক মূর্তি মাথা হেলাইয়া জানাইল, হ্যাঁ, সে-ই আসিয়াছে। আর কথা বলা উচিত নয়, মণিমালা নিঃশব্দে নামিয়া আসিল।

চাতাল পার হইয়া গুপ্ত সিঁড়ি গুপ্তপথে নামিয়াছে। বাহির হইতে কিছুই দেখা যায় না। সিঁড়ি শেষ হইয়া রাস্তায় নামিবার মুখে চৌকাঠ পায়ে বাধিয়া মণিমালা পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতে কালমূর্তি একখানা হাত দিয়া ধরিল।

উষ্ণ-শুষ্ক হাতের ছোঁয়া। শরীর মন প্রতিবাদ করিয়া ওঠে অন্তরঙ্গতার বিরুদ্ধে। মণিমালা হাতের দিকে তাকাইল, রাঙা সূতার ডোর-পরা গৌরবর্ণ পুষ্ট একটি মণিবন্ধের স্মৃতি মণিমালার মনে গাঁথা আছে। শুষ্ক কাগজের মত, হলুদ হাত! ও!

"আমি যাব না। তুমি কে?" কাল মুখোসের আড়াল হইতে দেখা গেল দুইটি চক্ষু—হিংস্র শ্বাপদের মত তীব্র; গোঁসাইজীর চক্ষে শুধু লালসা ছিল, এ চক্ষে পশুর হিংসা। লালসার মধ্যে হিংসা। এ চোখ মণিমালা আগে দেখে নাই। মণিমালা জানে না। অভ্রের হাতঝাড়, কাগজের পাহাড়, হাতী ঘোড়া ও ময়ূরপঙ্খীর শোভাযাত্রা, নহবৎ, ঢোল ও ব্যাণ্ড-এর বাজনার মধ্যে রূপার থে্ানে বসা ছবির ন্যায় সুন্দরী নববধূ যখন মুখোপাধ্যায় বাড়ীর বিরাট ফটকে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন গেটের দেওয়ালে ছায়ার ন্যায় একজন ব্যক্তি মিশিয়াছিল। অনিমেষ দৃষ্টিতে কিশোরী নরপরিণীতার লজ্জারুণ মুখখানির মাধুরী লেহন করিয়া সে লইতেছিল। এই চোখ মাণমালা নিজে না দেখিলেও চোখ মণিমালাকে ভাল করিয়াই দেখিয়া রাখিয়াছিল। সে লি-পো।

মণিমালার স্বামীকে লি-পো ঠিকমত চিঠি দিয়াছিল। চোরা সিঁড়ির সন্ধান জানিতে বাড়ীর ছেলেকে লি-পোর প্রয়োজন ছিল। সিড়ির গুপ্ত সুড়ঙ্গ উদ্‌ঘাটিত হইবার পরে মণিমালার স্বামী বাধা মাত্র। সুতরাং গুপ্তপথে ত্রিতলে উঠিতে উঠিতে সরল বিশ্বাসী কিশোরকে লি-পো হত্যা করে। অস্ত্রের আবশ্যকতা ছিল না। পুরাতন পাপী লি-পোর হাত দুখানাই অস্ত্র। সহস্র হত্যায় অভিজ্ঞ হাত রাইফেলের অপেক্ষাও অব্যর্থ।

গোঁসাইজীরও সারাজীবন রাধেশ্যাম গুণকীর্তন করিয়া বিদেশীর হস্তে মৃত্যু লেখা ছিল। চাতালে সিঁড়ির পায়ের কাছে কালো পদ্ম আঁকা পাথরে মণিমালার স্বামীর দেহ। মুখের পাশে পাথরের বুকে কয়বিন্দু রক্তলেখা। শতাব্দীর বিস্মরণও সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই পাথরের বক্ষে চুণী ফুটিয়া আছে।

তারপর? আর তো জানি না। কেয়া সোম আর জানে না। ছিন্নপত্র উড়িয়া গেল, আকাশ চিত্রহীন হইল। অতীত আবার বোবা হইয়া গেছে, সারাটি বাড়ী পাষাণের ন্যায় নির্বাক হইয়া রহিল। কেয়া সোম, আমরা আর কথা বলিব না। গভীর রহস্যের যেটুকু জানিয়াছ যথেষ্ট। তোমাদের চোখ নাই, তোমাদের মন নাই। তাইতো শতাব্দীর সঞ্চিত কাহিনী তোমাদের চোখে ধরা পড়ে না। তাইতো গল্প খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরো তোমরা। যেখানে এত বড় নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, প্রতি মুহূর্ত এখনও বেদনার ভারে মুহ্যমান, দরদী পথিকের কাছে অতীত বলিয়া দিতে চায় তাহার কাহিনী, সেখানে চা-সিগারেটের মৌতাত লইয়া তোমরা ভাবিয়া হতাশ হও কাহিনীর অভাবে। তোমাদের কি বলা যায়?

আমার পাঠক, আমার পাঠিকা, অতীত কাহিনী সম্পূর্ণ বলে না, আভাসে জানায় মাত্র। তারপর ইচ্ছামত গড়িয়া তোলার ভার তো তোমাদের। যদি চাও ভাবিয়া নাও, মণিমালা উন্মত্ত লি-পোর লুব্ধ করগ্রাস হইতে পলাইয়া বাঁচিল; অথবা ভাবিয়া নাও লি-পো অথবা মণিমালা একজনের জীবনান্ত হইল; কিংবা চাহিয়া দেখ, সরু গলির পথে অসংখ্য চীনা শিশু। তাদের মধ্যে কোন্‌টি মণিমালার সন্ততি?

আমার গল্প তোমরা শেষ কর। কেয়া সোম আর জানে না।

কেয়া সোম কাগজপত্র গুছাইয়া উঠিল। রাত্রি দশটা বাজে। আর থাকা যায় না। নিঃশেষিত চায়ের পটের পাশে প্রতীক্ষায় লাভ নাই। অতীত আর কথা বলিবে না। কেয়া সোম ভুল বলিয়াছিল। অতীত ইতিহাসে আস্থা রাখে না, সে উপন্যাস রচনা করে। পাকা লেখকের প্রথায় কৌতূহল অটুট রাখিয়া সে হঠাৎ লেখা বন্ধ করিয়া দেয়। কেয়া সোমকে বোকা বানাইয়া সে কৌতুক পাইল। কিছু দূর বলিয়া আবার পূর্বের মত সে নীরব রহিল।

বারবিলাসিনী কলিকাতার পথে যাত্রা। উত্তপ্ত বাতাস এখন স্নিগ্ধ। হয়তো নগরীর জ্বালা জুড়াইবার সময় আসিয়াছে।

কেয়া নিঃস্তব্ধ গৃহে ফিরিল। মা-বাবা তন্দ্রামগ্ন। কেশর বাহিরের ঘরে চিন্তিত মুখে পায়চারি করিতেছে। কেয়াকে যেন দেখিয়াও দেখিল না। অপ্রতিভ লজ্জায় মুখ তাহার ফেরানো।

নিজের ঘরে জামা-কাপড় পরিবর্তন করিল কেয়া অতি নিরাসক্ত-ভাবে। চম্পার উপস্থিতিহীন গৃহ থাকিবে কেয়া জানিত। অতীতের যেটুকু কেয়া জানে তাহাতে চম্পার পরিণতি সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অবহিত।

ধীরে-সুস্থে কেয়া নিজের আহার সমাপ্ত করিল। চম্পাকে রক্ষা করিবার উপায় কাহারও নাই। অদৃষ্ট-চক্র।

ধীরে কেয়া শয়নের উদ্যোগ করিল। চম্পার জন্য নিশা-জাগরণে লাভ নাই। কেশর জাগিতেছে। ফল হইবে না।

বড় আলো নিভাইয়া টেবিলের আলো জ্বালিয়া রাখিয়া কেয়া শয়ন করিল।

অনেক পরে প্রত্যাগামিনীর পদচিহ্ন সে-ঘরে বাজিল। কেয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

"দিদি, এখনও জেগে আছ?" চম্পার স্বর ভাঙা-ভাঙা।

"বড় আলো জ্বালাও, চম্পা। তোমাকে দেখি।"

প্রখর আলোর নীচে দ্বিধাহীন উন্নতশিরে চম্পা দাঁড়াইল। তরবারির মত দৃপ্ত সবল তনু তার। কিন্তু, ওকি? চম্পার জামায়, হাতের উপর রক্তের দাগ।

ও রক্তচিহ্ন বহুদিনের রক্ত-সমুদ্রে মিশিয়া গেল। সেই বাড়ীটির সিঁড়ির নীচের রক্তের চুণী বিন্দু চম্পার গায়ে যেন জ্বলিতে লাগিল। সারা পৃথিবী কেয়ার চোখে লাল রংয়ে রঞ্জিত হইল।

তিক্ত হাসির সঙ্গে চম্পা বলিল, "ভয় পেয়ো না। কাউকে খুন করে আসিনি। নিজেও খুন হইনি। তবে, ওই জন্তটাকে হত্যা করাই উচিত।

"কে জন্ত? শেঠ, না শেঠমল?"

"দুই-ই সমান। তোমাকে গোপন করার ফল হাতে হাতে পেলাম। দাদা তো লজ্জায় তোমাকে মুখ দেখাতে পারছে না।"

"এর মধ্যে দাদা?"

"বা রে, এটা তো দাদারই ব্যাপার। সুমিত্রার জন্যে দাদা মরে যাচ্ছে দেখে আমার ভারি খারাপ লাগত। সামান্য টাকা জামিন রাখলে বড় চাকুরি হ'বে, সুমিত্রাও বিয়ে করবে। তাই আমি দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতাপ শেঠের কাছে টাকাটা ধার চাই।"

"ছি, ছি!"

চম্পা অপ্রতিভ হাস্যে বলিল, 'ঠিক এমনি তুমি করবে বলে আমরা তোমাকে আগে বলতে সাহস পাইনি। ভেবেছিলাম সমস্ত ঠিক হ'লে পরে জানাব।"

"তারপর?"

"প্রতাপবাবু বল্লেন যে, তিনি খুব আনন্দের সঙ্গেই টাকাটা দিতেন। কিন্তু, সিনেমা কম্পানিতে টাকা ঢেলে হাত ওঁর শূন্য। উনি গণেশবাবুকে বলে ব্যবস্থা করলেন। আমরা ঠিক করলাম প্রত্যেক মাসে দাদার নূতন চাকরির একটা কিস্তি টাকা দেনায় যাবে। আমরা ব্যবস্থা না করে ধার চাইনি, দিদি।"

"তারপর?"

"দাঁড়াও হাত মুখ ধুয়ে আসি। গা ঘিন্-ঘিন্ করছে।"

পাথরের মূর্তির মত কেয়া বসিয়া রহিল। না জানি কি ভয়ানক কথা চম্পা তাহাকে শুনাইবে।

তোয়ালেতে হাত মুছিতে মুছিতে চম্পা প্রবেশ করিল।

"বাঁচলাম এতক্ষণে। আজ কি গরম, দিদি!"

"এখনও তোমার গরমের বিষয় মাথায় আসছে।"

"চম্পা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন, কি হয়েছে? আমি জব্দ হয়েছি, তাই বলছো?"

"অমন রক্তারক্তি অবস্থা কি শুধু জব্দ হ'বার ফল?"

"আচ্ছা, খুলে বলছি, শোন না। তখন গণেশবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্যে দাদা আর আমি ওদের সঙ্গে বেড়ানো শুরু করলাম বাড়ীর বাইরে। এক একবার আমি ভাবতাম, তোমার কাছে গোপন করা কি ভাল হচ্ছে! কিন্তু প্রতাপবাবু তোমাকে আগেই বলতে নিষেধ করেছিলেন। ওঁকে বড় বিশ্বাস করেছি। গণেশকে খুব ভাল লাগত না। কিন্তু, সহ্য করতাম যে দাদার কাজটা হয়ে যাক। তাছাড়া, প্রতাপবাবুর বন্ধু।"

"প্রতাপকে এত বিশ্বাসের কারণ কি?"

চকিতে চম্পার মুখ লাল হইয়া গেল, সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তার কারণ আমি মূর্খ, আমি বোকা। বাইরের পালিশে ভুলেছিলাম। যাই হোক, প্রতাপবাবু বললেন যে, গণেশবাবু টাকাটার বিষয়ে আমার সঙ্গে শেষ কথা কিছু বলতে চান। দাদার সামনে হবে না। আমি ভাবলাম কারবারী লোক, সুদ চায় বোধ হয়। দাদার সামনে বলবে না। ভাবলাম, আজই শেষ কথা হ'বে, যাই। প্রতাপবাবু নিয়ে গেলেন। একটা সাধারণ বাড়ী। বোধ হয় গণেশবাবুর ছোট একখানা বাড়ী সেখানে নাকি কাজকর্মের কথা হয়।"

"চম্পা, চম্পা!"

"অমন চীৎকার করো না, দিদি। পাশের ঘরে মা উঠে পড়বেন। প্রতাপ একটু পরে ছুতো নিয়ে 'আসছি' বলে চলে গেল গণেশ আর আমি একা রইলাম।"

"তারপর?"

"গোড়ায় অবশ্য ও খুব তোয়াজ করল। প্রতাপ নাকি তোমাকে ভালবাসে, ও নাকি আমাকে ভালবাসে, আমার জন্য ও নাকি পৃথিবীর সব কাজ করতে পারে। আমি চুপ করে বসে শুনছিলাম। ও সমস্ত কথাই বলতে লাগল। আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ও নাকি প্রতাপকে জাহাজ কিনবার টাকা

দেবে। ও দাদাকে তো টাকা দেবেই, আমাকে বাড়ী করে দেবে, এই রকম জঘন্য জঘন্য কথা।”

“তারপর?”

“তারপর—দিদি, আমার গায়ে হাত দিল। আমি এক ধাক্কায় ওকে ফেলে দিলাম। টেবলের কোণা লেগে ওর কপাল কেটে রক্তারক্তি। ও আবার আমাকে ধরবার চেষ্টা করল। আমি এক ঝটকায় ছাড়িয়ে দেওয়ালের একটা ব্রাকেট খুলে নিয়ে বা’র হয়ে এলাম রাস্তায়। ওর লোকজন কেউ ধরবার চেষ্টা করলে মাথা ফাটিয়ে দিতাম। তবে কেউ আমাকে তাড়া দেয় নি। ও-ও ঘর থেকে বা’র হল না আর কাটা কপাল নিয়ে। ট্যাক্সি ডেকে চলে এলাম।”

হা-হা করিয়া হাসিতে হাসিতে চম্পা বলিল, “ভেবেছিল বাঙালীর মেয়ে দুর্বল। আমার গায়ে জোর দেখে অবাক হ’ল কুকুরটা।”

শক্তিরূপিনী নারীর কাছে অতীত পরাস্ত হইল। তৃতীয় শতাব্দীতে হয়ত অভিশাপের তীব্রতা হ্রাস পাইয়াছে। অতীতের বিয়োগান্ত পটভূমিকা হইতে আপন মহত্ত্বে নারীসত্তা মুক্তিকে জয় করিয়া লইল। অদৃষ্টচক্র অতিক্রম করা চলে নারীর পক্ষে কেবল শক্তিসাধনার দ্বারা।

হঠাৎ আলোর নীচে চম্পার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল, “প্রতাপবাবু এত ছোট ভাবতে পারিনি। দিদি, ওঁকে বড় ভাল লেগেছিল।” চম্পা বালিশে মুখ গুঁজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

কেয়া নীরবে আলো নিভাইয়া দিল। চম্পার চোখের জলের সাক্ষী মাত্র বালিশটি থাক। অতীত চম্পাকে মুক্তি দিলেও ব্যথার ছোঁয়ায় স্পর্শ করিতে ভোলে নাই। কিশোরীর প্রথম প্রেম একটু খোঁচা দিবেই। কিন্তু জানে কেয়া শক্তিময়ী চম্পার নূতন প্রভাতে প্রতাপ শেঠের চিহ্নমাত্র থাকিবে না।

জানালার ধারে কেয়া বসিল। একা। এমনি চিরদিন সে একা। অতীত সত্তার এক অংশ শক্তিসাধনায় প্রতিষ্ঠা পাইবে। অন্য অংশ কি চির বিরহের প্রহর গণিয়া যাইবে?

বহুদূরের, তপ্ত নগরীকে শীতল-করা জাহ্নবী সমীর ভাসিয়া আসিল। বাতায়ন-পার্শ্ববর্তিনী বিরহিণীর অবিন্যস্ত অলকস্তরে দোলা দিল সে। কানের কাছে বলিল," এখনও কি প্রতীক্ষার শেষ হয় নাই? ভোগের সমুদ্র তীরে চির ব্রহ্মচর্যে দিন যে কাটিয়া গেল।

মদালসা বারবনিতা কলিকাতা দিনান্তে গঙ্গাজলের অবগাহনে সমগ্র তমসা বিসর্জন দিয়া উদয় প্রতীক্ষায় বিনিদ্র প্রহর গণিতেছে। প্রেমের উষার আশায় সে-ও প্রতীক্ষু!

কেয়া সোম নিশ্বাস ফেলিল। কলিকাতার বুকে সঞ্চিত দুই শতাব্দীর দীর্ঘশ্বাসে সেই নিশ্বাস মিশিয়া গেল।

অনেক পথিকের মধ্যে জন্মান্তরের হারানো প্রিয়কে কেমন করিয়া খুঁজিয়া পাইবে কেয়া? অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় কালসমুদ্রে মজ্জমান। তবু কেয়া প্রতীক্ষা করে। অর্থে সামর্থ্যে গর্বিত প্রার্থীর জন্য কেয়া সোম নয়। কেয়ার একমাত্র মূল্য প্রেম। নারীর আত্মসমর্পণের একমাত্র মূল্য প্রেম।

জানি না অভিশাপের শেষ হইবে কিনা। জানি না বিরহিণী সে দয়িতের সন্ধান পাইবে কিনা।

কেয়া সোমের গল্পের শেষ এখানেই। ইহার পরে মুখোপাধ্যায় বধূ মণিমালার বক্তব্য হয়তো কিছু আছে।

কিন্তু, সে তো অন্য কাহিনী।